Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পারুল আক্তার

রোলঃ 216020357227

২০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পারুল আক্তার

রোলঃ 216020357227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের গুণ ও মর্যাদা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে পারুল আক্তার, আইডিঃ 216020357227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুল ইসলাম
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

পারুল আক্তার

আইডিঃ 216020357227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মুমিন

মুমিন একটি আরবি শব্দ, যা মূলত আরবি ঈমান শব্দটি থেকে এসেছে।

[১] এর শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাসী" এবং এর দ্বারা

একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বুঝায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়দৃ ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের

সকল কর্মকান্ডে ধারণ করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরুপে সমর্পণ করে। নারীদের ক্ষেত্রে মুমিনা

শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কুরআনে মুমিনের পরিচয় বলা হয়েছেঃ-

ذين يومنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وباالخرة هم

-يوقنون.اوألك علي هدي من ربهم واوألك هم المفلحون

।

মুসলিম হল ইসলাম ধর্মকে নিজ ধর্মবলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে এমন ব্যক্তি। অপরদিকে, মুমিন হল ইসলাম ধর্মকে

নিজ ধর্মবলে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পাশাপাশি তা নিজের ভেতরে ও বাহিরে ধারণ করে এবং সাথে-সাথে

কঠোরভাবে এর নির্দেশাবলী মেনে চলে এমন ব্যক্তি। অর্থা ৎ, বলা যায়, সকল মুমিন মুসলিম, কিন্তু সকল মুসলিম

মুমিন নয়।

[২]

মুমিন ব্যক্তির সংজ্ঞা

ইমান অর্থ বিশ্বাস। মুমিন মানে বিশ্বাসী। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীকে মুমিন বলা হয়। ইসলাম মানে

আনুগত্য, মুসলিম অর্থ অনুগত ব্যক্তি, যিনি ইমানের সঙ্গে নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসুল-এর

যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। মুমিন ও মুসলিম জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মেতা অর্জন

করতে হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র হই।

(আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ১৩)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

মুমিনের আখলাক

চরিত্র কি আল্লাহ প্রদত্ত নাকি অর্জিত?

আমাদের নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

"আমি নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য নবী হয়ে এসেছি।" [মুয়াত্তা ইমাম মালিক:১৬১৯]

আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন আমাদেরকে আখলাক শেখানোর জন্য, মানুষের সাথে আমরা কেমন আচরণ করবো তা শেখানোর জন্য।

'আখলাক' শব্দটি 'খুলুক' শব্দের বহুবচন। 'খুলুক' এসেছে সেই ধাতু থেকে, যে ধাতু থেকে 'খালাকা' এসেছে; যার অর্থ সৃষ্টি করা। 'খালক' আর 'খুলক' এর ধাতুমূল এক। একটার মানে হলো সৃষ্টি করা, আরেকটার মানে হলো চরিত্র। খালক হলো আপনার শরীরের বাইরের অংশ, খুলক হলো আপনার শরীরের ভেতরের অংশ। আপনার হাত, পা, চোখ, নাক এগুলো হলো 'খালক'; আপনার আচার-ব্যবহার, কথা বলার ধরণ, চারিত্রিক গুণাবলী হলো 'খুলক'।

আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ আখলাককে তিনভাবে ভাগ করেন। যেমন:

১। আল্লাহর প্রতি আপনার আখলাক:

আল্লাহর প্রতি ঈমান, ইখলাস, ভালোবাসা, সুধারণা রাখা হলো এই ধরণের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

২। মানুষের প্রতি আপনার আখলাক:

মানুষের সাথে কেমন আচরণ করবেন, ধৈর্যধারণ করা, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়বিচার করা হলো এই ধরণের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

৩। নিজের সাথে আখলাক:

আপনি নিজের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন এটা তৃতীয় প্রকার আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। আপনি যখন কোনো কিছু করেন, সেটা ভালোভাবে করবেন।

আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো দ্বিতীয় প্রকার আখলাক। একজন ভালো মুসলিম হতে হলে কী কী করতে হবে আমরা আখলাক সংক্রান্ত আলোচনা থেকে শিখবো। মনে রাখবেন, ভালো মুসলিম হওয়া মানে শুধু বেশি বেশি ইবাদাত করা না; 'মুয়ামালাত'ও এর অন্তর্ভুক্ত। আপনাকে ভালো মুসলিম হতে হলে যেমন বেশি বেশি ইবাদাত করতে হবে, তেমনি উত্তম চরিত্রের অধিকারীও হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমনও হতে পারে একজন চরিত্রবান বান্দাকে আল্লাহ এমন আসনে আসীন করতে পারেন, যে আসনে সেই বান্দা আছে যে নিয়মিত নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে। [মাজমু আল-আওসাত: ৩৯৮২, শায়খ আলবানীর মতে সহীহ]

একজন নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, নফল রোজা রাখে; কিন্তু আরেকজন সেগুলো করে না। যে নিয়মিত নফল নামাজ পড়ে না, নফল রোজা রাখে না, সে দেখা গেলো উত্তম আখলাকের অধিকারী। কিয়ামতের দিন দেখা যাবে তার উত্তম আখলাকের কারণে আল্লাহ তাকে নিয়মিত ইবাদাতকারীর সমান আসনে বা উপরের আসনে রাখবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে ওজনে বেশি আর কোনো জিনিস হবে না। কেননা, আল্লাহ অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।" [জামে আত-তিরমিজি:২০০২]

আখলাককে কোনোভাবেই ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘরের জিম্মাদার।" [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮০০]

আমরা বুঝলাম সচ্চিরিত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে, আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় হলো- সচ্চরিত্র কি আল্লাহ প্রদত্ত নাকি এটা অর্জন করতে হয়? আমরা কি আমাদের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নাকি এটা নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে?

যারা অনেক সন্তানের জনক বা জননী, তারা জানেন যে তাদের একেক সন্তান একেক রকম। কোনো সন্তান খুব ধৈর্যশীল, কোনো সন্তান সহজে রেগে যায়, কোনো সন্তান চাপ নিতে পারে, কোনো সন্তান চাপ নিতে পারে না। মানুষের মধ্যে এমন বৈচিত্র প্রায়ই চোখে পড়ে। ঠিক একই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন।

আশাজ্জ ইবনে কায়স নামের এক গোত্রপতি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন,

"ও আশাজ্জ! তোমার দুটো বিশেষ গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। সেগুলো হলো- ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা।"

আশাজ্জ ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের প্রশংসা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই কি এই গুণ অর্জন করেছি নাকি আল্লাহ আমাকে এই দুটো গুণের ওপর সৃষ্টি করেছেন?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন:
"আল্লাহ তোমাকে এই দুটো গুণের ওপর সৃষ্টি করেছেন।"
অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু ওতা আ'লা আশাজ্জ ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সৃষ্টির সময় এই দুটো গুণ দান করেন, গুণ দুটো তিনি নিজে অর্জন করেননি। এটা শুনে আশাজ্জ ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:
"আলহামদুলিল্লাহ্, কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দুটো স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন; যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।" [সহীহ মুসলিম: ২৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫২২৫]
আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করেছেন, যেভাবে তোমাদের মধ্যে রিযিক বণ্টন করেছেন।" ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ: ২৭৫]
কেউ কেউ ধনী হিশেবে জন্মায়, কেউ কেউ গরীব হিশেবে। কেউ কেউ রাজা-বাদশাহর ঘরে জন্মায়, কেউ কেউ বস্তিতে জন্মায়। কেউ খুব সহজে অর্থোপার্জন করতে পারে, কেউ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তেমন অর্থোপার্জন করতে পারে না। একই কথা চরিত্রের বেলায়ও। চরিত্রের কিছু উপাদান আছে জন্মগত, কিছু উপাদান আছে অর্জন করে নিতে হয়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"জেনে রাখো! মানুষের মধ্যে কারো রাগ আসে দেরিতে এবং চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি। আবার কারো রাগ আসে তাড়াতাড়ি, চলে যায়ও তাড়াতাড়ি। কারো রাগ আসে তাড়াতাড়ি, চলে যায় দেরিতে। তবে, তাদের মধ্যে উত্তম হলো- যাদের রাগ আসে দেরিতে কিন্তু চলে যায় তাড়াতাড়ি। আর তারাই খুব নিকৃষ্ট- যাদের রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে যায় দেরিতে।" [জামে আত-তিরমিজি: ২১৯১]
এখন কেউ বলতে পারে, আল্লাহ যেহেতু আমাকে ধৈর্য ক্ষমতা কম দিয়েছেন, আমি অধৈর্য হয়ে গেলে আমার দোষ কী? আল্লাহ আমাকে ক্ষমাশীলতার গুণ দেননি, এতে আমার দোষ কী?
এর জবাবে আমরা বলি- এটা ঠিক যে আল্লাহ আপনাকে ধৈর্যশীল বানাননি; তারমানে এই না যে ধৈর্যশীল হবার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন না। চরিত্রের কিছু উপাদান আছে জন্মগত, কিছু উপাদান আছে অর্জন করে নিতে হয়। চরিত্রের কিছু উপাদান আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা চাইলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কিভাবে আমাদের চরিত্র বদলাতে পারি? কিভাবে আমরা সচ্চরিত্রবান হতে পারি? চারটি বিষয়ের আলোকে আমরা কথা বলবো, ইন শা আল্লাহ।
১। আমরা সবকিছু জ্ঞানানুযায়ী করবো। আমাদেরকে জানতে হবে আখলাক কাকে হবে, উত্তম আখলাকের অধিকারী হবার ফযিলত কী, কিভাবে উত্তম আখলাক অর্জন করতে হয়, কুরআন-সুন্নাহ উত্তম আখলাকের ব্যাপারে কী বলে।

পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই লোকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে আখলাক শেখান। যদিও জন্মগতভাবে তাঁর ছেলে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু গুণাবলী অর্জন করেছিলো, তারপরও বাবা হিশেবে তিনি ছেলেকে আখলাক শেখান।

২। আপনার একজন রোলমডেল দরকার। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হলে আপনাকে উত্তম চরিত্রের একজনকে অনুসরণ করতে হবে। আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক প্রশংসা করে বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা আল-কালাম ৬৮: ৪]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আরো বলেন:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পড়ে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, পাশাপাশি আমাদের আশেপাশে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শমতো জীবনযাপন করেন, তাদেরকে দেখেও শিখতে পারি।

৩। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় আমরা থিওরি পড়ি, চাকরি করার সময় সেই থিওরি প্রয়োগ করি। এতে করে আমাদের থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিকাল দুই ধরণের জ্ঞান আহরণ হয়। আমরা ভুল করি, ভুল থেকে শিক্ষা নিই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জিত হয়। আর সহনশীলতার অনুশীলন করার মাধ্যমে সহনশীলতা অর্জিত হয়।" [তারীখে বাগদাদ: ৯/১২৯; শায়খ আলবানীর মতে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য]

আপনি রসায়নের বই বিছানার পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়লে রসায়নের জ্ঞানার্জন করতে পারবেন না। রসায়নের জ্ঞানার্জন করতে হলে আপনাকে পড়তে হবে। একই কথা কোনো গুণের ব্যাপারে। আপনি যদি কোনো গুণ অর্জনের চেষ্টা না করেন, তাহলে সেই গুণটি অর্জন করতে পারবেন না।

সহনশীলতার গুণ অর্জন করতে হলে আপনাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। আপনি এমন একটি অবস্থার মুখোমুখি হলেন, যখন আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তখন সেই অবস্থায় আপনি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবেন। মুখস্থ বই পড়ে ধৈর্যধারণ করা যায় না। এটা প্রায়োগিক বিষয়। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেটার অনুশীলন করতে হবে।

৪। আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। সবকিছুর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে; এমনকি সচ্চরিত্রবান হবার জন্যও। আল্লাহ আপনাকে যতোই সচ্চরিত্রবান হিশেবে সৃষ্টি করুন, আপনি যতোই সচ্চরিত্রের গুণ অর্জন করুন না কেনো, তারপরও আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সচ্চরিত্রের জন্য দু'আ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেন:

“হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোত্তম আখলাক বা নৈতিকতার পথ দেখান। আপনি ছাড়া আর কেউ এই পথ দেখাতে সক্ষম নয়। আর আখলাক বা নৈতিকতার মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখুন। আপনি ছাড়া আর কেউ মন্দগুলোকে দূরে রাখতে সক্ষম নন।” [সহীহ মুসলিম: ১৬৯৭]

সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী হয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয়াবনত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দু’আ করছেন- আল্লাহ যেনো তাঁকে উত্তম আখলাকের অধিকারী করেন, মন্দ আখলাক থেকে দূরে রাখেন। সেখানে আমাদেরকেও যে দু’আ করতে হবে সেটা বলা বাহুল্য। আমরাও আল্লাহর কাছে উত্তম আখলাকের জন্য দু’আ করবো।

মনে করুন, আল্লাহ একজনকে ধৈর্যশীলতার গুণ দান করেন আর আরেকজনকে সেটা দান করেননি। যাকে দান করেননি সে প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই গুণ অর্জন করলো। বাহ্যিকভাবে দুজনই ধৈর্যশীল। কিন্তু, যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধৈর্যশীলতার গুণ অর্জন করছে, সে কোনো ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরলে তারচেয়ে বেশি সওয়াব পাবে, যাকে আল্লাহ ধৈর্যশীলতার ওপর সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং, আপনার যদি কোনো উত্তম গুণাবলী না থাকে, আপনি চেষ্টা করে যান সেই গুণাবলী অর্জন করতে। যখন আপনি সেই গুণাবলী অর্জন করবেন, আপনি তারচেয়ে বেশি সওয়াব পাবেন যার এমনিতেই সেই গুণ ছিলো।

আপনি বিনয়ী নাকি অহংকারী?

নম্রতা হলো মুমিনের আখলাকের অন্যতম উপাদান। কেউ কেউ বলেন এটা হলো 'আখলাকের রাণী'। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।" [সূরা ফুরকান ২৫: ৬৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদাত করা ও বিনয়, নম্রতাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। এজন্য আমাদের আলেমগণ বলেন- 'ঈমানের বৈশিষ্ট্য হলো নম্রতা'। আপনার যদি ঈমান থাকে, আপনি বিনয়ী হবেন। আপনার যদি ঈমান থাকে, আপনি অহংকারী হবেন না।

আজকে আমরা জানবো নম্রতা কাকে বলে, নম্রতার বৈশিষ্ট্য কী, কিভাবে নম্রতা অর্জন করতে হয়। নম্রতার আরবি হলো 'তাওয়াদু'। ওয়াদওয়াহ মানে হলো- নিজেকে ছোটো হিশেবে উপস্থাপন করা, নিচে নেমে পড়া। আপনি যখন নিজের ইগোকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোটো হিশেবে উপস্থাপন করবেন, তখন এই গুণ অর্জন করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই গুণ অর্জন করতে বলেন। আল্লাহ বলেন:

"আপনি মুমিনদের জন্য আপনার বাহু অবনত করুন।" [সূরা আল-হিজর ১৫: ৮৮]

আল্লাহ রূপক অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুমিনদের জন্য নম্র হতে বলেন। বাহু নত করা নম্র হওয়ার নামান্তর। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নম্র হতে বলেন, আমাদেরকেও সেই গুণ অর্জন করতে হবে সেটা এই আয়াতে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি জানিয়ে দিতে বলেন-

"তোমরা বিনয়ী হও, যতোক্ষণ না একে অপরের ওপর যুলুম এবং অহংকার করে।" [সহীহ মুসলিম: ২৮৬৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৯৫]

কে বিনয়ী এবং কে বিনয়ী নয় এটা চেনার কিছু উপায় আছে। আমাদের আলেমগণ এরকম কিছু লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। সামনে আসার ইচ্ছে প্রকাশ না করা

আপনি যখন অনেকের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন, তখন যদি মনে করেন সবাই আপনাকে নিয়ে কথা বলুক, আপনাকে কেন্দ্র করে তাদের আলোচনা চলুক, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে বিনয়ের গুণটি নেই। আপনি যদি আশা করেন, আপনাকে সবাই মান্য করুক, গুরুত্ব দিক; গুরুত্ব না দিলে আপনার রাগ হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে এই গুণটি অনুপস্থিত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা নেতৃত্ব চায়, তাদেরকে আমরা নেতা বানাই না। ইসলামের এটা রুল অব থাম্ব।

২। মানুষ যখন আপনার প্রশংসা করবে, আপনি অস্বস্তিভোগ করবেন

আপনি যদি আশা করেন মানুষ আপনার প্রশংসা করবে, প্রশংসা না করলে আপনি যদি রাগ করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে নম্রতা নেই। হ্যাঁ, আপনার কোনো গুণের জন্য মানুষ আপনাকে

প্রশংসা করতে পারে; আপনি তখন আল্লাহর প্রশংসা করে সেটার কৃতিত্ব আল্লাহকে দিবেন। কিন্তু, মনে মনে এটা ভাবতে হবে- আপনি এমন প্রশংসা লাভের যোগ্য নন।

৩। ভুল হলে সংশোধনের মানসিকতা রাখা

আপনি বিনয়ী নাকি অহংকারী সেটা বুঝতে পারবেন যখন কেউ আপনাকে ভুল ধরিয়ে দিবে। ইবাদাতের ক্ষেত্রে ভুল হলে আপনি তাওবা করবেন, মানুষের সাথে কোনো ভুল করলে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। যদি এমন হয়, আপনি একটি ভুল করেছেন, একজন ভুল ধরিয়ে দিলো, আপনি জানেন আপনারটা ভুল ছিলো; কিন্তু আপনি ভুল স্বীকার করলেন না, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে অহংকার জন্ম নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহংকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

“প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।” [সহীহ মুসলিম: ১৬৬]

অহংকার করে সত্য অস্বীকার করা হলো শয়তানের কাজ। শয়তানের এই কাজকে আল্লাহ ‘কুফর’ হিশেবে আখ্যায়িত করে বলেন:

“সে অস্বীকার করলো এবং অহংকার করলো। আর সে হলো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা বাকারা ২:৩৪]

আল্লাহর কাছে বিনয়ের বিপরীত হলো কুফর। আল্লাহকে স্বীকার করা কিংবা অহংকারবশত অস্বীকার করা।

আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। তাঁর পুরো জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই তিনি বিনয়ের শতো শতো উদাহরণ রেখে গেছেন। তিনি এমনভাবে জীবনযাপন করতেন যে, বাইরে থেকে কেউ আসলে জিজ্ঞেস করতো, ‘তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন না যে মানুষজন তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াক। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

“সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। অথচ তারা তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা, তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৭৫৪]

তিনি খুব সাধারণ পোশাক পরতেন, ঘরের কাজ করতেন, নিজের জুতো নিজে সেলাই করতেন, গাধা-খচ্চরের ওপর আরোহণ করতেন। কেউ কেউ তাঁকে ‘আবুল কাসিম’ বলে ডাকতো, তিনি কিছু মনে করতেন না।

এখন কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, বিনয়ী হলে লাভ কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাব দেন।

তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, “আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের জন্য কোন ব্যক্তির জন্য হারাম?” সাহাবীরা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দেন-

"যে ব্যক্তি মানুষের কাছাকাছি, সহজ-সরল, নম্রভাষী ও সদাচারী।" [জামে আত-তিরমিজি: ২৪৮৮]
তবে একটি জিনিস বলে রাখা ভালো, নম্রতা মানে এই না যে আপনি মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে কিছুই দেননি। বিনয় বা নম্রতার মানে হলো আপনি নিজেকে অন্যের চেয়ে বড়ো ভাববেন না, অন্যকে অবজ্ঞা করবেন না। আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন সেটার শুকরিয়া আদায় করবেন, একইসাথে নিজেকে 'মহান' ভাববেন না।

আপনি নিজেকে ছোটো মনে করলে কী হবে? আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে অন্যের চেয়ে খাটো ভাবলে কী হবে?

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। সেই খুতবায় তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এক স্তর বিনয়ী হবে (এই বলে তিনি একটি হাত নিচে নিলেন), আল্লাহ তাঁর মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন (এই বলে তিনি একটি হাত উপরে নিলেন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর নিচু করে দিবেন; শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হীনগ্রস্তদের মধ্যে হীনতমে পরিণত করবেন।" [মুসনাদে আহমাদ: ২৭৩২৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৭৬]

এটা সত্য যে, আপনি যদি বিনয়ী হোন, সবাই আপনাকে পছন্দ করবে। আর আপনি যদি জোর করে সবার ভালোবাসা, সম্মান আদায় করতে চান, আপনি ব্যর্থ হবেন। আপনার ক্ষমতার জন্য আপাতত কেউ কেউ আপনাকে সম্মান দেখাতে পারে। কিন্তু, মনে মনে তারা আপনাকে সম্মান করবে না; বরং ঘৃণা করবে।

মজার ব্যাপার হলো- যে বিনয়ী, সে নিজেকে ছোটো ভাবলেও মানুষজন তাকে বড়ো ভাবে। অন্যদিকে, যে অহংকারী, সে নিজেকে বড়ো ভাবলেও মানুষজন তাকে নিচু মন মানসিকতার ভাবে!
প্রত্যেক নবী-রাসূল বিনয়ী ছিলেন। বিনয় ছিলো তাঁদের ভূষণ। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা সেই গুণ কিভাবে অর্জন করবো?

১। আমরা অহংকারের পরিণতি নিয়ে ভাববো

যখন আমরা অহংকারের পরিণতি নিয়ে ভাববো, তখন আমরা বিনয়ী হতে পারবো। আমরা যখন জানবো ইবলিশ, ফেরাউন, আবু লাহাবের পরিণতির কারণ ছিলো তাদের অহংকার, তখন আমরা সেই বদ-গুণ থেকে দূরে থাকতে পারবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" [সহীহ মুসলিম: ১৬৭]

অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি আমাদেরকে নিরহংকারী বানাতে উৎসাহ জুগাতে পারে।

২। অন্তরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা

আপনি কখনো যদি মনে করেন আপনার অন্তর অহংকারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখন তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আপনি সবসময় ভাববেন, আপনি যে জিনিস নিয়ে অহংকার করছেন, সেটা

আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন, তখন আর অহংকার করতে পারবেন না। আপনি তখন মনে করবেন- আমি এটার যোগ্য না, তারপর আল্লাহ দয়া করে আপনাকে দান করেছেন।

৩। গোপন আমল করা

যখন কেউ আপনাকে দেখছে না, তখন আপনি আমল করুন। এমন গোপন আমল বাড়িয়ে দিন। তাহাজ্জুদ পড়ুন এবং লুকিয়ে সাদকা করুন; ডানহাতে দিলে যেনো বামহাত বুঝতে না পারে।

৪। কোনো হালাল কাজকে অবজ্ঞা করবেন না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জুতো সেলাই করতেন। তিনি চাইলে তাঁর কোনো সাহাবীকে বলতে পারতেন, তারা সেই কাজ করে দিতো। কিন্তু, তিনি নিজে সেই কাজ করেন। এটা থেকে আমরা শিখতে পারি, আমরা নিজের জন্য যেমন কোনো হালাল কাজকে ছোটো করে দেখবো না, তেমনি কাউকে সেটা করতে দেখলে তাকেও খাটো করবো না।

উমর উবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন খলিফা। একবার উমর ইবনুল খাত্তাব পানির কলসি বহন করছিলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ খলিফাকে এই অবস্থায় দেখে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার জন্য এটা শোভা পায় না।"

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন:

"প্রতিনিধি দল যখন আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমার কাছে আসে, তখন আমার মনে একধরণের বড়ত্ব অনুভব হয়। তাই এই বড়ত্বকে ভেঙ্গে ফেলা আমি জরুরি মনে করছি।" [ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, মাদারিজুস সালিকিন: ২/৩৩০]

গতো শতাব্দীর একজন বড়ো আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক। একবার সবাই দেখলো সেই আলেম মসজিদের টয়লেট পরিষ্কার করছেন। সবাই অবাক হলো। তাঁর ছেলে বললো, "আব্বা, এসব কী করছেন? এসব করার জন্য তো লোক আছে।"

জবাবে তিনি সেই একই কথা বললেন, যে কথা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন- "আমি আমার মনে একধরণের বড়ত্ব অনুভব করেছি। তাই এই বড়ত্বকে ভেঙ্গে ফেলা আমি জরুরি মনে করছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবী এবং বড়ো বড়ো আলেমগণ এমন ছোটোখাটো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন না।

৪। গরীব, দুর্বলদের সাথে সময় কাটানো

আপনি যদি অসহায়, গরীব, দুর্বলদের সাথে সময় কাটান, তাহলে দেখবেন বিনয়ী হতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আমাকে খোঁজ করো তোমাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব-দুর্বল তাদের মাঝে। কেননা, তোমরা রিযিক এবং সাহায্য-সহযোগিতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকো অসহায়-দুর্বল লোকদের ওয়াসিলায়।" [জামে আত-তিরমিজি: ১৭০২]

আপনি সারাক্ষণ শুধু ধনীদের সাথে, বিখ্যাত মানুষদের সাথে ঘুরবেন না। মাঝেমধ্যে গরীবদের সাথেও সময় কাটান। তাদের কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করুন। সমাজের মানুষজন যাদেরকে মূল্যায়ন

করেনা, তাদেরকে কাছে টেনে নিন। মাঝমধ্যে এতিমখানায় ঘুরে আসুন। দেখবেন, নম্রতা, বিনয় আপনার মধ্যে চলে আসবে।

আপনি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী?

সত্যবাদিতা মুমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আপনি যদি একজন নিয়মিত মিথ্যাবাদী হন, তাহলে আপনি মুমিন হতে পারবেন না। একজন মুমিন কখনো অনবরত মিথ্যা বলতে পারে না। সূরা আহযাবে আল্লাহ জান্নাতবাসীদের কিছু গুণের কথা উল্লেখ করেন। সেই গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সত্যবাদিতা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান (জান্নাত) প্রস্তুত করে রেখেছেন।" [সূরা আহযাব ৩৩: ৩৫]

আপনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে কিয়ামতের দিন সত্যবাদিতা আপনার কাজে আসবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝

আল্লাহ বলবেন, 'এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য।

[সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ১১৯]

আপনি যদি সত্যবাদী হন, তাহলে আপনার সততার জন্য আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সততার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন।" [সূরা আহযাব ৩৩: ২৪]

আল্লাহ যেমন আমাদেরকে সত্য বলার নির্দেশ দেন, সত্য বলায় উৎসাহিত করেন, তেমনি আমাদের বন্ধু কারা হবে তাদের সম্পর্কেও বলেন। আমরা যেন মিথ্যাবাদীদেরকে বন্ধু হিশেবে গ্রহণ না করি সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক করে বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।" [সূরা তাওবা ৯: ১১৯]

আমরা যদি মিথ্যাবাদীদেরকে বন্ধু হিশেবে গ্রহণ করি, তাদের সাথে থাকতে থাকতে একসময় আমরাও মিথ্যা বলা শুরু করবো। এজন্য আমাদের বন্ধু কারা সেটা যাচাই করতে হবে। যদি দেখা যায় আমাদের বন্ধুরা অনবরত মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"সত্য নেকির দিকে পরিচালিত করে আর নেকি জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের ওপর কায়িম থেকে অবশেষে 'সিদ্দীক' –এর দরজা লাভ করে। মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়।" [সহীহ বুখারী: ৬০৯৪]

দেখুন, সত্যের পথ জান্নাতে, মিথ্যার পথ জাহান্নামে। আপনি অনবরত মিথ্যা বলা শুরু করলে মিথ্যা বলা আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু নাজ্জাশীর সামনে ইসলামের বার্তা তুলে ধরেন। জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের বার্তা পাঁচটি পয়েন্টে উল্লেখ করেন। তারমধ্যে একটি ছিলো-

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সত্য বলতে নির্দেশ দেন।"

সুতরাং, এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, আমাদেরকে অবশ্যই সত্য বলতে হবে। কোনো কিছু বলার আগে সেটা যাচাই করে নিতে হবে। তবে, তিনটি ক্ষেত্রে কথা বলার সময় আমাদেরকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে সেসব ক্ষেত্রে আমরা সত্য কথা বলছি।

১। যখন আমার দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলবো

যখন আমরা ইসলাম নিয়ে কোনো কথা বলবো, তখন ১০০% নিশ্চিত হয়ে বলতে হবে। ইসলাম নিয়ে কোনো মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। কোনো বিষয়ে যদি আমাদের জানা না থাকে, তাহলে আমরা স্বীকার করবো যে- আমরা জানি না। কিন্তু, না জেনে কিছু বলবো না।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না।" [সূরা আন-নাহল ১৬: ১১৬]

আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে হলে জেনেশুনে বলতে হবে। নিজের মনগড়া কোনো কথা বলা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তোমরা আমার ওপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ, আমার ওপর যে মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে যাবে।" [সহীহ বুখারী: ১০৬]

আমরা যদি বলি 'এটা রাসূলুল্লাহ বলেছেন' বা 'এটা হাদীসে আছে' তাহলে নিশ্চিত হয়ে বলতে হবে। নিজেদের বানানো কোনো কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে চালিয়ে দেয়া যাবে না। যারা এমন করে, তাদের স্থান জাহান্নামে।

২। আল্লাহর নামে কসম করে মিথ্যা বলা

এমনিতে তো মিথ্যা বলা গুনাহের কাজ, আল্লাহর নামে কসম করে মিথ্যা বলা তারচেয়ে বেশি ভয়ানক। আপনি যদি কারো সাথে কথা বলার সময় বলেন 'আল্লাহর কসম!' বা 'ওয়াল্লাহি', তারপর যদি মিথ্যা বলেন তাহলে আপনার অনেক বেশি গুনাহ হবে। বিশেষ করে আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময়।

৩। ব্যবসা করতে গিয়ে মিথ্যা বলা

ব্যবসায়ীরা মুনাফার্জনের জন্য অনেক সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তারা বলে, 'পণ্যটি আমি ১০০০ টাকা দিয়ে কিনেছি, আপনাকে কেনা দামে বিক্রি করছি'। আসলে দেখা যায় তারা পণ্যটি কিনেছে ৭০০ টাকা দিয়ে, ৩০০ টাকা লাভে বিক্রি করছে। সে মনে করে মিথ্যা বলার কারণে তার ৩০০ টাকা লাভ হয়েছে। আসলে মিথ্যা বলার কারণে তার ব্যবসায় বরকত কমে গিয়েছে সেটা সে বুঝতে পারছে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"ক্রেতা-বিক্রেতা যদি সত্য বলে এবং পণ্যের অবস্থা ব্যক্ত করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তবে তদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হবে।" [সহীহ বুখারী: ২০৭৯]

আপনি সততার সাথে ব্যবসা করলে ব্যবসায় যেমন লাভ হবে, তেমনি আল্লাহ সেই ব্যবসায় বরকত দান করবেন। আর মিথ্যাকে পুঁজি করে ব্যবসা করলে মানুষজন একসময় না একসময় আপনার প্রতারণা ধরে ফেলবে। আপনি দুনিয়াতে অপদস্থ হবেন, আখিরাতেও।

তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। ইসলাম সেসব ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াকে অনুমতি দিয়েছে। যেমন: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীকে এমন একটি কথা বললো, যেটা আসলে সত্য নয়, তবে কথাটি তাদের মধ্যকার বন্ধন বাড়াবে। এসব ক্ষেত্রে এমন মিথ্যা কথা ইসলাম সমর্থন করে।

যেমন: স্বামী স্ত্রীকে বললো, 'তোমার হাতের বিরিয়ানী পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু বিরিয়ানী, তুমি যে গরুর মাংস রান্না করো, আমি পৃথিবীর কোথাও এমন খাবার খাইনি'।

একটি সুন্দর মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীকে বললো 'তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে'।

এসব মিথ্যাকে ইসলাম 'মিথ্যা' বলে মনে করে না। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের জন্য প্রয়োজনে এমন মিথ্যা বলাকে ইসলাম অনুমতি দেয়। আপনি আপনার ছোট্ট ছেলে-মেয়ের প্রশংসা করেও এমন কিছু বলতে পারেন।

দুজন মানুষের মধ্যে যদি মন কষাকষি হয়, তাদেরকে একত্র করতে প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে পারেন। যেমন: একজনকে বলতে পারেন, অমুক তো তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে অনুতপ্ত, সে আমাকে বললো তোমার সাথে কথা বলতে চায়। আবার, অন্যজনকে গিয়ে বলুন, অমুক সেদিন যেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, এটার জন্য পরে কষ্ট পেয়েছে। সে চাচ্ছে তোমার সাথে কথা বলতে। আসো, তার সাথে গিয়ে কথা বলি।

এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাকে অনুমোদন দিয়েছেন। সেগুলো হলো:

একজনের সাথে আরেকজনের মন কষাকষি মিটিয়ে দেবার সময়
যুদ্ধের সময়
স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ক মজবুত করতে মিথ্যার আশ্রয় নিলে। [মুসনাদে আহমাদ: ২৬৭৩১]
এখন প্রশ্ন হলো, সত্য বললে লাভ কী?

আপনি যখন সত্য বলবেন, সেই সত্য বলার মাধ্যমে নেকি অর্জন করবেন। আপনি যখন কিছু লিখবেন, সেটা যদি সঠিক হয় তাহলে আপনি নেকি অর্জন করবেন। আপনি সত্য বললে আপাতত আপনার কোনো ক্ষতি হলেও দীর্ঘকালীন এর সুবিধা ভোগ করবেন।

কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাবুক যুদ্ধে না যাবার অজুহাত দেখাতে কেউ কেউ যখন মিথ্যার আশ্রয় নেবার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তখন সত্যের ওপর অটল থাকেন। মিথ্যা বলায় অনেকের অজুহাত গ্রহণ করা হয়েছিলো, সত্য বলায় তিনি আপাতত বিপদে পড়েছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীতে তাঁর এই সত্যবাদিতা তাঁকে পুরস্কৃত করে। আল্লাহ তাঁর ঘটনা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন। [সহীহ বুখারী: ৪৪১৮]

আপনি যখন মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, তিনি আপনাকে শুনছেন, তখন আপনি সত্য বলতে পারবেন। কারণ, আপনি জানেন আর কেউ জানুক বা না জানুক, আল্লাহ জানেন প্রকৃত ঘটনা কী। আপনাকে আল্লাহ দেখছেন, ফেরেশতারা পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে আপনি মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। জীবনের যে পরিস্থিতি আসুক না কেনো।

আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে চান, তাহলে সত্য কথা বলুন। কেননা, সত্যবাদীদের স্থান জান্নাতে, মিথ্যবাদীদের স্থান জাহান্নামে।

কীভাবে প্রজ্ঞাবান হবেন?

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জ ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুটো গুণ পছন্দ করেন। দুটো গুণের মধ্যে একটি হলো 'হিলম'। হিলম শব্দের দুটো অর্থ হয়। সেই দুই অর্থ দুটো গুণ বুঝায়। সেগুলো হলো:
প্রজ্ঞা
রাগ নিয়ন্ত্রণ

আজ আমরা প্রজ্ঞা নিয়ে কথা বলবো। প্রজ্ঞা হলো এমন এক গুণ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেন। এটা মুমিনের আখলাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো 'আল-হাকিম'; যার মানে হলো প্রজ্ঞাবান।

প্রজ্ঞার আরবি শব্দ হলো 'হিকমাহ'। যে জিনিস যেখানে থাকার কথা, সেখানে রাখা বুঝাতে আরবরা হিকমাহ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। আলেমগণ হিকমাহর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-
"কোনো কিছু এমনভাবে করা, যার ফলে ক্ষতি কমানো যায় এবং লাভ বাড়ানো যায়।"
অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য এমনকিছু করা, যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ হয় বেশি, ক্ষতি হয় কম।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে।" [সূরা বাকারা ২: ২৬৯]

আল্লাহ লুকমান আলাইহিস সালামকে প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

"আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম আর বলেছিলাম, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।" [সূরা লুকমান ৩১: ১২]

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে হিকমাহ দান করতে পারেন। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ যেহেতু আমাকে হিকমাহ দান করেননি, আমার করার কী আছে?

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, চরিত্রের কিছু অংশ আল্লাহ দান করেন, কিছু অংশ অর্জন করে নিতে হয়। আল্লাহ আপনাকে হিকমাহ দান করেননি মানে এই না যে আপনি সেটা অর্জন করতে পারবেন না।

প্রত্যেকের যেমন শক্তিমত্তা আছে, তেমনি দুর্বলতা আছে। একেকজনকে আল্লাহ একেকভাবে সৃষ্টি করেছেন। তার মানে এই না যে, আপনাকে যে গুণ দেয়া হয়নি সেটা অর্জনের চেষ্টা করবেন না। আপনার মধ্যে যদি কোনো চারিত্রিক গুণ না থাকে, তাহলে আপনি সেটা অর্জনের চেষ্টা করবেন। একইভাবে আমরা হিকমাহ বা প্রজ্ঞার গুণও অর্জন করতে পারি। কিভাবে? কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে দাওয়াত দেবার পদ্ধতি বলে দেন।

সেই আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দেন-

"তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন।" [সূরা আন-নাহল ১৬: ১২৫]

যদি এমন হতো যে, প্রজ্ঞার গুণ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, আমরা সেই গুণ অর্জন করতে পারবো না, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে বলতেন না। আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে বলেছেন প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে, সেহেতু এই গুণ আমাদের মধ্যে না থাকলেও আমরা সেটা অর্জন করতে পারি।

হিকমাহর অনেকগুলো ভাগ আছে। সেগুলো হলো:

১। দ্বীনের ব্যাপারে হিকমাহ:

শ্রেষ্ঠ হিকমাহ হলো দ্বীনের ব্যাপারে হিকমাহ। দ্বীনের ব্যাপারে হিকমাহ মানে হলো- শরীয়তে যেভাবে বলা আছে, সেভাবে জীবনযাপন করা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"প্রজ্ঞার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহকে ভয় করা।" [ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান: ৭১২]

যখন আপনি বুঝবেন কে আপনাকে সৃষ্টি করছেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কী কী করতে হবে, সেটা হবে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:
“নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা ৪: ১৭]
সাহাবীগণ বলতেন:
“আল্লাহর বান্দা যে গুনাহের কাজ করে, তা তারা না জানার কারণে অজ্ঞতাবশতই করে।” [তাফসীরে তাবারী: ৮/৮৯]
সাহাবীগণ আরো বলতেন:
“বান্দা যে গুনাহই করুক, সেটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই করা হোক না কেনো, সেটা তারা অজ্ঞতাবশত করে।” [তাফসীর ইবনে কাসির: ২/৩০৯]
আপনি যদি আল্লাহর আদেশ, নির্দেশ মেনে চলেন, তাহলে আপনি প্রজ্ঞাবান। আর আপনি যদি আল্লাহর আদেশ অমান করেন, তাহলে আপনি অজ্ঞ। এখানে, প্রজ্ঞার বিপরীত হলো অজ্ঞতা।
২। মানবজাতির সাথে হিকমাহর সহিত আচরণ
আপনি যখন কারো সাথে কথা বলবেন, লেনদেন করবেন, তখন হিকমাহর সাথে করবেন। আপনি আপনার শত্রুর সাথেও হিকমাহর সাথে আচরণ করবেন। হিকমাহর প্রয়োগের ফলে আপনার সম্পর্ক গড়তে পারে, হিকমাহর অভাবে সম্পর্ক ভাঙ্গতে পারে। অনেক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার মূল কারণ হলো হিকমাহর সাথে আচরণ না করা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, অফিসের কর্মকর্তা-মালিকের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় হিকমাহর সাথে কাজ না করার ফলে।
৩। হিকমাহর সাথে ব্যবসা করা
ব্যবসা করার ক্ষেত্রে হিকমাহর প্রয়োজন। আপনি যখন কিছু কিনবেন, তখন বুঝেশুনে কিনবেন। যখন কিছু বিক্রি করবেন, তখনও বুঝেশুনে বিক্রি করবেন।
এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে আমরা হিকমাহ অর্জন করতে পারি? কিভাবে আমরা প্রজ্ঞাবান হতে পারি?
১। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে
যেকোনো কিছু পেতে হলে সবার আগে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। আপনি যদি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে চান, আল্লাহ আপনাকে দান করবেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন-
“হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে হিকমাহ শিক্ষা দিন।” [সহীহ বুখারী: ৩৭৫৬]
তখন এমন না যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেননি বা তিনি ছোটো ছিলেন। তিনি তখন কিশোর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই অবস্থায় তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, আল্লাহ যেন তাঁকে হিকমাহ শিক্ষা দেন, তাঁকে যেন প্রজ্ঞাবান বানান।
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেন- ‘রাব্বি হাবলি হুকমা’। অর্থাৎ-
“হে আল্লাহ! আমাকে হিকমাহ দান করুন।” [সূরা আশ-শুআরা ২৬: ৮৩]
২। জ্ঞানার্জন করা

আপনি যদি প্রজ্ঞার গুণ অর্জন করতে চান, আপনাকে জ্ঞানার্জন করতে হবে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আপনি প্রজ্ঞাবান হতে পারেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একটি দু'আর উল্লেখ করেন:

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

"হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিবেন; আর তাদেরকে পবিত্র করবেন।" [সূরা বাকারা ২: ১২৯]

আমরা কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞানার্জন করে দ্বীনের প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারি। অন্যান্য বিষয়ের বইপত্র পড়ে সেসবের প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারি।

৩। অভিজ্ঞতা

উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রজ্ঞা অর্জন করা যায় না।"

অনেকসময় দেখবেন কিশোর-যুবকরা কোনো কিছু ভাবনা-বিচার ছাড়াই একটি কাজ করে। কারণ, তাদের অভিজ্ঞতা নেই। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষরা হুট করে ভাবনা-চিন্তা ছাড়া কোনো কাজ করে না।

অভিজ্ঞতা আপনাকে এমন কিছু শেখাবে, যা বই শেখাতে পারবে না।

৪। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

আপনি যদি খোলা মনে কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আপনার আশেপাশের সমাজ, মানুষের কাছ থেকে প্রজ্ঞা শিখতে পারবেন। তাদেরকে দেখে বুঝতে পারবেন কিভাবে প্রজ্ঞার সাথে কোনো কাজ করতে হয়। কিন্তু, আপনি যদি অহংকারী হন, তাহলে আপনার দ্বারা হবে না। আপনি শিখতে পারবেন না।

আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ বলতেন:

"প্রজ্ঞবান সে, যে অন্যের ভুল দেখে শিখে; অন্যরা তার ভুল দেখে শেখার আগে।"

একই ভুল একজন করেছে। আপনি শিখেছেন। আপনি সেই ভুল করেননি। কিন্তু, আপনিও যদি একই ভুল করেন, তাহলে তো আপনি প্রজ্ঞাবান হলেন না।

আপনি যদি দ্বীনি ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হতে চান, তাহলে প্রজ্ঞাবান আলেমের সাহচর্যে থাকুন। আপনি যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হতে চান, তাহলে প্রজ্ঞাবান ব্যবসায়ীর সাথে থাকুন।

৫। ইতিহাস পাঠ

আপনি ইতিহাস পড়লে মানব জাতির উত্থান পতনের কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনি বুঝতে পারবেন কী করার ফলে কোন জাতির বা কোন ব্যক্তির পতন হয়েছে এবং কিসের ফলে কোনো জাতি বা কোনো ব্যক্তি সফল হয়েছেন। আপনার বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে ইতিহাস পাঠ সহায়ক হবে। আপনি অতীতের সাথে বর্তমানের মিল খুঁজে পাবেন।

যেভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করবেন

এক ঢিলে তিন পাখি শিকার

গতো পর্বে আমরা 'হিলম' নিয়ে আলোচনা করেছি। হিলমের দুটো অর্থ। একটি অর্থ হলো প্রজ্ঞা, আরেকটি অর্থ হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ। আজ আমরা রাগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করবো।

আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো 'আল-হালিম'। আল্লাহর ক্ষেত্রে আল-হালিম মানে হলো- যিনি তাঁর সৃষ্টির ওপর রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন, যদিও তাঁর সৃষ্টি রাগ করার মতো কিছু করেছে। অর্থাৎ, মানুষ এমন কোনো কাজ করেছে, যার ফলে আল্লাহ মানুষের ওপর রাগান্বিত হতে পারেন। কিন্তু, তিনি রাগান্বিত না হয়ে তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় 'আল-হালিম'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এরপরও তিনি তাদেরকে বিপদমুখ রাখেন এবং রিযিক দান করেন।" [সহীহ বুখারী: ৬০৯৯]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নিজেকে অনেকবার 'হালিম' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন:

"তোমরা তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল (হালিম)।" [সূরা বাকারা ২: ২৩৫]

আল্লাহ হলেন আল-হালিম। রাগ করার মতো কাজ করা সত্ত্বেও তিনি রাগান্বিত হন না। তিনি যেমন আল-হালিম, তেমনি যারা এই গুণে গুণান্বিত তিনি তাদের প্রশংসা করেন। পবিত্র কুরআনে তিনি নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেন, কারণ তিনি এই গুণে গুণান্বিত।

নিজের রাগকে সংযত রাখা হলো মুমিনের অন্যতম গুণাবলী। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই গুণের প্রশংসা করেন এবং যারা নিজেদের রাগ সংযত করে, তাদেরকে তিনি তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দেন। সেগুলো হলো:

ক্ষমা করে দিবেন

জান্নাত দান করবেন

মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমিনের সমান; যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (এগুলো তাদের জন্য) যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং রাগ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৩৩-১৩৪]

এখানে উল্লেখ যে, যারা রাগ সংবরণ করে তাদের কথা বুঝাতে আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটা হলো 'কাজিমিনা গাইজা'; তিনি 'কাজিমিনাল গাদাভ' শব্দটি ব্যবহার করেননি। এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী?

‘কাজিমিনা গাইজ’ মানে হলো যখন আপনি রাগান্বিত হওয়া শুরু করেন, তখনই সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন।

‘কাজিমিনাল গাদাভ’ মানে হলো আপনি রাগ করার পর একসময় রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

এখানে, আল্লাহ বলেন, যারা রাগ শুরু হবার সাথে সাথেই তা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের জন্য পুরস্কার। এর মানে হলো, আপনি রাগান্বিত হবার আগেই রাগ নিয়ন্ত্রণ করবেন যাতে করে আপনার রাগ ‘গাদাভ’ পর্যন্ত না পৌঁছায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।” [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৮৯]

যেমন ধরুন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যদি আপনি একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করেন, সেটা গিলে ফেলার পর আপনার কেমন লাগবে? আপনি কতোটা সন্তুষ্ট হবেন? ঠিক তেমনি, আপনার যদি রাগ উঠে আর আপনি সেটা সংবরণ করেন, তাহলে সেটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পরামর্শ নিতে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পরামর্শ দিলেন-

“রাগ করো না।”

লোকটি আরো উপদেশ নিতে চাইলো। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই তাকে বললেন, “রাগ করো না।” [সহীহ বুখারী: ৬১১৬]

তখন সে বুঝলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই উপদেশই দিলেন। একটি মাত্র উপদেশ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।

আমরা বলেছিলাম যে, হিলমের দুটো অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ প্রজ্ঞা, আরেকটি অর্থ রাগ নিয়ন্ত্রণ। দুই গুণের মধ্যে মিল আছে। আপনি যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে আপনি প্রজ্ঞাবান হতে পারবেন না। আপনাকে প্রজ্ঞাবান হতে হলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, “সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি কে?” সাহাবীরা বললে, “যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে।”

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে পরাজিত করে। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।” [সহীহ বুখারী: ৬১১৪, সহীহ মুসলিম: ৬৫৩৫]

যে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে মূলত তিনটি শক্তির ওপর বিজয়ী হয়। সেগুলো হলো:

যে নিজের নফসকে পরাজিত করে

নিজের সাথে থাকা শয়তানকে পরাজিত করে

তাকে যে রাগান্বিত করে, ঐ লোকটির সাথে থাকা শয়তানকে সে পরাজিত করে।

আপনি যদি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে আপনি এক ঢিলে তিনটি পাখি শিকার করলেন!

আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পড়লে অবাক হবেন। দেখবেন তাঁর জীবনে এতো এতো ঘটনা ঘটেছে, রাগান্বিত হবার মতো এতো এতো কারণ ছিলো, কিন্তু তিনি নিজের রাগকে ঐভাবে প্রকাশ করেন। তিনি নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

আমরা দেখতে পাই, আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শান্তশিষ্ট, তারাও মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হয়। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ব্যতিক্রম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে একবারও নিজের রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাননি; তাঁর পরিবারের সাথে হোক বা সাহাবীদের সাথে হোক।

হ্যাঁ, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন। কিন্তু, তাঁর রাগ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। সাহাবীরা তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারতেন যে, তিনি রাগ করেছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাজের মধ্যে তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন না।

আমাদের মধ্যে অনেকেই রাগান্বিত হলে মোবাইল ছুঁড়ে ফেলে, প্লেট-গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটা করতেন না।

একবার এক সাহাবী বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর রাগ করেছেন। তিনি দেখতে পান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসির মাধ্যমে তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তিনি হাসছেন, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে রাগ মিশ্রিত ছিলো।

আপনি বলতে পারেন যে, ‘আমি বদমেজাজী। আমার রাগ হলে আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমার কী করার আছে!’

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে একেক মানুষ একেক মেজাজের অধিকারী। যেমন ধরুন, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তারা ছিলেন দুই প্রকৃতির। একজন ঠাণ্ডা মেজাজের, একজন গরম মেজাজের। তারপরও দেখা যায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বেশি রাগান্বিত ছিলেন। অন্যদিকে খলিফা হবার আগের উমর এবং খলিফা হবার পরের উমর ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রম। খলিফা হবার পর তিনি আগের মতো কঠোর ছিলেন না, তিনি তাঁর রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

যারা বলে, ‘আমি গরম মেজাজের, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না’ তাদের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যারা এমনিতে ঠাণ্ডা মেজাজের, আর যারা নিজেরা অনেক চেষ্টা-সাধনার পর ঠাণ্ডা মেজাজের হয়েছেন, দুজনের সওয়াব কিন্তু সমান হবে না। যিনি প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি বেশি সওয়াব পাবেন।

এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে আমরা রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?

১। দু’আ করা:

দুজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাগান্বিত হলেন। একজন আরেকজনকে গালাগালি করলেন। রাগের আতিশায্যে একজনের চেহারা তো টগবগে লাল হয়ে গিয়েছিলো, রগগুলো ফুলে উঠেছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, “আমি এমন একটা দু'আ জানি, যেটা পড়লে রাগ দূর হয়ে যাবে।”

দু'আটি কী?

দু'আটি হলো-

'আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বয়ান'। [সহীহ বুখারী: ৩২৮২]

এটা হলো রাগ কমানোর দু'আ। কেউ যদি রাগের মধ্যে এই দু'আটি পড়ে, আল্লাহ তার রাগ কমিয়ে দিবেন।

এই রাগের কারণে অনেক সম্পর্ক নষ্ট হয়, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, চাচা-ভাতিজার মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন দেখা দেয়। আমরা যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে এমনটা হবে না।

২। ওজু করা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“রাগ আসে শয়তান থেকে। শয়তানকে আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। অতএব, তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেনো ওজু করে নেয়।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৮৪,

৩। কাজ কমিয়ে দেয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“তোমাদের কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়, সে যেনো বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ কমে, তাহলে তো ভালো; অন্যথায় সে যেনো শুয়ে পড়ে।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৮২]

৪। নিরবতা অবলম্বন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে সে যেনো নীরবতা অবলম্বন করে।” [ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদ: ২৪৪]

সুন্নাহর আলোকে রাগ নিয়ন্ত্রণের এই চারটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। সাইকলজিস্টরা আরেকটি পদ্ধতির কথা বলেন। সেটা হলো- কোন কাজটির ফলে আপনি রাগান্বিত হতেন, সেটা উপলব্ধি করা। যে কাজটির ফলে আপনি রাগান্বিত হন, সেটা কমিয়ে দেয়া বা না করা।

মনে করুন, ফেসবুকে কারো পোস্ট পড়লে আপনার রাগ উঠে। যতোবার তার পোস্ট চোখের সামনে আসে, ততোবার আপনি রাগে ফুসফুস করেন। এক্ষেত্রে আপনার কাজ হলো সেই ব্যক্তিকে 'আনফলো' করা। তার পোস্ট পড়ার দরকার কী বা তার ভিডিও দেখার দরকার কী?

আপনি যখন রাগান্বিত হবেন, তখন কিছুক্ষণ কথা বলা বা কাউকে রিপ্লাই দেয়া বাদ দিন। যখন রাগ কমবে, তখন কথা বলুন বা ফেসবুকে কমেন্ট-রিপ্লাই দিন।

রাগ আমাদের অনেক শারীরিক সমস্যার কারণ। যেমন: উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ হলো রাগ। কেউ আপনাকে কিছু বললে তার মুখ থামাতে পারবেন না। কিন্তু, তার উপর আপনি রাগ করবেন নাকি ক্ষমা করে দিবেন সেটা চাইলে করতে পারেন। সেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে।

সাইকোলজিস্টরা বলেন, বেশিরভাগ রাগের অন্যতম কারণ হলো আমাদের ইগো। আপনি রাগ করেন কেনো? কারণ, আপনি মনে করেন যে, আপনার মর্যাদা হানিকর কোনো কথা বলা হয়েছে বা কোনো কাজ করা হয়েছে। আপনি যদি নিজেকে ছোটো করে দেখা শুরু করেন, বিনয়ী হন, উদারতা দেখান, দেখবেন রাগ করার মতো কারণ কমে আসবে।

আপনি যদি বিনয়ী হন, কেউ যদি আপনাকে কোনো কথা বলে, আপনি নিজেকে সংযত রাখতে পারবেন।

একবার এক ভরা মজলিশে একজন উঠে জিজ্ঞেস করলো- "আপনিই কি শাফে'ঈ?" ইমাম শাফে'ঈ রাহিমাহুল্লাহ হ্যাঁ বললে লোকটি বলে উঠলো- "তুমি একজন নিকৃষ্ট পাপী।"

ইমাম শাফে'ঈ তৎক্ষণাৎ দু'আ করলে:

"ইয়া আল্লাহ! লোকটি যা বললো তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। আর যা বললো তা যদি মিথ্যে হয় তাহলে মিথ্যে বলার জন্য তাকেও ক্ষমা করুন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"যদি কোনো মানুষকে যাচাই করতে হয়, সে যখন শান্ত থাকে তখন যাচাই করো না। বরং সে যখন রাগান্বিত হয়, তখন তাকে যাচাই করো।"

অর্থাৎ, একজন রাগান্বিত মানুষের আচরণ বলে দেয় সে কেমন মানুষ, তার মধ্যে নীতি-নৈতিকতাবোধ কেমন। ঠাণ্ডা মাথায় আপনি নীটি-নৈতিকতা, আদব-আখলাক শিখলেন। কিন্তু, এগুলো যখন প্রয়োগ করার সময় আসে, তখন যদি আপনি উত্তেজিত হয়ে অনৈতিক কাজ করেন, বেয়াদবি কাজ করেন, তাহলে মুখস্থ নীতি-নৈতিকতা শিখে তো আপনার কোনো লাভ হলো না।

যার আমানতদারিতা নেই,তার ঈমান নেই

একজন মুসলিমকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে। সে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, মানুষজন যেন তাকে বিশ্বাস করে। সে যেন সবার বিশ্বাসের পাত্র হতে পারে। একজন মুসলিম হয়ে সে কিভাবে প্রতারণা করতে পারে?

বিশ্বস্ততার আরবি শব্দ হলো 'আমানাহ'। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একটি শক্তিশালী আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে।" [সূরা আন-নিসা ৪: ৫৮]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ‘সূরা মুমিনূন’ –এ মুমিনের ১৫ টি গুণের কথা উল্লেখ করেন। সেইসব গুণের মধ্যে একটি হলো- আমানত রক্ষা। আল্লাহ বলেন:

“এবং যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।” [সূরা মুমিনূন ২৩: ৮]

সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে উল্লেখ করেন:

“হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।” [সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওতা’আলা সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে সম্মানিত ফেরেশতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন:

“বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে।” [সূরা আশ-শুআরা ২৬: ১৯৩]

জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ‘রুহুল আমিন’ বিশ্বস্ত আত্মা/ফেরেশতা বলে উল্লেখ করেছেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে প্রশংসা করার জন্য অনেকগুলো বিশেষণ ছিলো। কিন্তু, আল্লাহ তাঁর জন্য বেছে নেন বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতার গুণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হিশেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে মক্কার লোকজন তাঁকে ‘আল-আমিন’ বলে ডাকতো। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই গুণের প্রশংসা করেন, মানুষজন এই গুণের প্রশংসা করে।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন খুতবা খুব কম দিতেন, যেসব খুতবায় তিনি এই কথাটি বলতেন না-

“যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই।” [মুসনাদে আহমাদ: ১১৯৩৫]

আপনি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করেন, কিন্তু আমানত রক্ষা না করেন, তাহলে বুঝা গেলো আপনার মধ্যে ঈমান নেই। আপনার মধ্যে ঈমান থাকলে আপনি আমানত রক্ষা করতেন। ঈমান থাকার মানে হলো আপনি আল্লাহকে ভয় পান, আপনি জানেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। ফলে, আপনি মানুষকে ঠকাতে পারবেন না, আমানতের খেয়ানত করতে পারবেন না।

আমানতের গুণ এতো প্রশংসিত যে, এই গুণ যদি অমুসলিমদের মধ্যেও পাওয়া যায়, আল্লাহ তার প্রশংসা করেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কতিপয় ইহুদি ও খ্রিস্টানের এই গুণের প্রশংসা করে বলেন:

“আর কিতাবীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি তার নিকট তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখো, তবুও সে তোমার কাছে ফেরত দিবে।” [সূরা আলে-ইমরান ৩: ৭৫]

আমানতের অনুপস্থিতিকে খেয়ানত বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের চারটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন। তারমধ্যে একটি লক্ষণ হলো-

“যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে।” [সহীহ বুখারী: ৩৪]

আমানতের রক্ষা করা ঈমানের পরিচয়, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের পরিচয়।

অনেকধরণের আমানত আছে। যেমন:

১। দ্বীনের আমানত:

দ্বীনের আমানত হলো আল্লাহর ইবাদাত করা, নামাজ পড়া, যাকাত আদায় করা, রোজা রাখা ইত্যাদি। এই ধরণের আমানতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:
“নিশ্চয়ই আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে।” [সূরা আল-আহযাব ৩৩: ৭২]

২। দায়িত্বের আমানত:

যখন আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়, সেটা একটি আমানত। সেই দায়িত্ব ঠিকমতো পালনের মাধ্যমে আপনি আমানত রক্ষা করতে পারেন। আপনার যতো বড়ো দায়িত্ব, আপনার আমানত ততো বেশি। যার কারণে, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রশংসা করা হয়; কেননা, তিনি তার আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করেন।

৩। আর্থিক আমানত:

কেউ যদি আপনার কাছে টাকা জমা রাখে, সেটা আপনার কাছে আমনত। ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্বে মানুষ মানুষের কাছে টাকা জমা রাখতো। কোথাও সফর করার পূর্বে সমস্ত টাকা বা সম্পদ তারা যাকে বিশ্বাস করতো, তার কাছে আমানত রাখতো। সেই আমানতের যথাযথ হেফাযত করা একজনের দায়িত্ব।

৪। জিহ্বার আমানত:

যখন্ন আপনি কাউকে কোনো কথা দিবেন, সেই কথা রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব; এটাও একপ্রকার আমানত।

৫। কথার আমানত:

কেউ যদি আমাদেরকে কোনো কথা বলে, সেটা গোপন করতে বলে, তাহলে সেটাও একপ্রকার আমানত। যদি তার গোপন কথাটি কাউকে বলে দিই, তাহলে সেটা আমানতের খেয়ানত হবে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“সকল মজলিশ আমানতস্বরূপ।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৬৯]
আড্ডায় অনেকসময় অনেক কথা বলা হয়। সেসব কথা ফেসবুকে পোস্ট করার আগে জিজ্ঞেস করে নিন, ‘কথাটি কি বলবো?’
এমনকি কেউ যদি গোপনে আপনাকে কিছু বলে, সেটাও গোপন রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনছে কিনা তা দেখলে) তা আমানতস্বরূপ।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৬৮]
কেউ কোনো কথা বলার পর ‘কথাটি গোপন রাখবেন’ বলতে হবে কেনো? আপনাকে সে বিশ্বাস করে কথাটি বলেছে, আপনি তার কথাটি অন্যকে বলবেন না; সে আপনাকে সতর্ক করুক বা না করুন। আপনি তার কথা বলার ধরণ দেখেই যদি বুঝেন, কথাটি গোপন কথা; তাহলে আপনি তা গোপন রাখুন।
মনে করুন, এক মজলিশে একজন আরেকজনের গীবত করলো। সে গীবত করে গুনাহ কামালো। আপনি যদি এখন যাকে নিয়ে গীবত করা হয়েছে, তার কাছে কথাটি পৌঁছে দেন সেটাও তখন গুনাহের কাজ। এটাকে বলা হয় ‘নামিমাহ’। গীবত যেমন হারাম, গীবতের কথা অন্যজনকে জানানোও হারাম।

৬। পরামর্শের ক্ষেত্রে আমানত:

কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চায়, সেটাও আমানত। যেমন: একজন একটি ব্যবসার জন্য কিছু পরিকল্পনা আপনাকে বললো। তার পরিকল্পনামাফিক আপনি তাকে কিছু পরামর্শ দিলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যবসায়ীকে যদি প্রথমজনের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন, সেটা হবে আমানতের খেয়ানত।
হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা বিধবা হবার পর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য পাত্র খুঁজেন। তিনি আবু বকর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে যান। কিন্তু, তারা তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেননি। তিনি খুব ব্যথিত হন। কারণ, তাঁর বন্ধুপ্রতীম দুজন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহর বিয়ের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ বলেন। তিনি বলেন:
“আপনার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় আপনি আমার ওপর ব্যথিত হয়েছেন। আপনি যখন প্রস্তাব দেন, আমি একটি কারণে তা প্রত্যাখ্যান করি। কারণ হলো- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর (হাফসা) সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি তিনি তাঁকে বাদ দিতেন, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করতাম।” [সুনানে আন-নাসাঈ: ৩২৪৮]
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের সেই গোপন কথা সম্পর্কে এতো সচেতন ছিলেন যে, তিনি তা তাঁর বন্ধু উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেননি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হবার কারণে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের অনেক গোপন বিষয় জানতেন, কখনোবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলতেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি

গোপন কথা বলেন। ছোট্ট বয়সেও তাঁর মধ্যে আমানতদারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাসূলের এই গোপন বিষয় সম্পর্কে তাঁর জন্মদাত্রী মা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আমানতের খেয়ানত তিনি করেননি। নিজের আপন মাকেও সেই কথাটি তিনি বলেননি। [সহীহ বুখারী: ৬২৮৯]

৭। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানত:

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানতের খেয়ানত হলো সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মানতের খেয়ানত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।" [সহীহ মুসলিম: ৩৪৩৪]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপনীয় বিষয়গুলো হলো আমানত। সেই আমানত বন্ধু-বান্ধবীর সাথে শেয়ার করা যাবে না। গোপন বিষয়গুলো অন্য কাউকে বলা যাবে না। স্বামী-স্ত্রী যদি নিজেদের একান্ত গোপনীয় ব্যাপারগুলো অন্যের সাথে শেয়ার করে, সেটা হবে সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ের আমানতের খেয়ানত। তবে, হ্যাঁ, প্রয়োজনে কিছু কথা বলা যেতে পারে। যেমন: ডাক্তারের কাছে। তাছাড়া, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়ন হলে সেটার মিটমাটের জন্য তারা তৃতীয় পক্ষের পরামর্শ নিতে পারে; সেগুলো ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু, সাধারণ নিয়ম হলো, গোপনীয়তা প্রকাশ করা যাবে না।

শেষকথা হলো, আমানত আর ঈমান অনেকটা পাশাপাশি। 'ঈমান' ও 'আমানত' একই ক্রিয়ামূল থেকে। আমানত হলো, আপনি কাউকে কিছু বলে স্বস্তি লাভ করেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"আমি কারো নামাজ, রোজা দেখে তাকে যাচাই করি না। কাউকে যাচাই করি তার আমানতদারিতা দেখে; নামাজ-রোজা তো সবাই পড়ে, সবাই রাখে।"

আমানতদারিতার গুণ অর্জন করতে বছরের পর বছর লেগে যায়। কিন্তু, এই গুণ ভাঙ্গতে একটি ছোট্ট ভুলই যথেষ্ট। এজন্য আমাদেরকে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ভালো কাজে অন্যকে সহযোগিতা

একজন মুমিন বিচ্ছন্নবাদী নয়, সে সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতে পারে না। মুমিনকে অবশ্যই সমাজে বসবাস করতে হয়। বৃহত্তর স্বার্থে একজন মুমিন আরেকজন মুমিনকে সহযোগিতা করে। কেউ যদি মনে করে যে, সে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদত করলে মনে হয় সহজে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যাবে, তাহলে এটা ভুল ধারণা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে সমাজে বসবাস করতে হবে, মুসলিম জামআতের সাথে থাকতে হবে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আসরে তিন শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা হলো:

"যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" [সূরা আল-আসর ১০৩: ৩]

এই আয়াতে প্রথম দুই আমল হলো ব্যক্তিগত আমল, শেষের আমলটি সামষ্টিক আমল। সেটা আপনি একা করতে পারবেন না। আপনি সবার সাথে বসবাস করলে তবেই অন্যকে সত্যের উপদেশ দিতে পারেন, ধৈর্যের দাওয়াত দিতে পারেন।

আপনি অন্যকে সহযোগিতা করতে হলে একসাথে বসবাস করতে হবে। প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ সমাজে বসবাস করেছেন। প্রত্যেকেই পৃথিবীতে এসেছেন সমাজ গঠন করতে, আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে। কেউই সমাজ ছেড়ে গুহায় বসবাস করতে মানুষকে নির্দেশ দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে দেখতে পাই, তিনি মক্কা ও মদীনায় সমাজ গড়ে তুলেন। ইন্তেকালের পূর্বে দুই সমাজেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়েছো।" [সূরা আলে ইমরান ৩: ১০৩]

সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, তারা প্রথমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা পরস্পর ভাই-ভাই হতে পেরেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন:

"একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য বিল্ডিংয়ের ইটের মতো, যার এক অংশ আরেক অংশকে শক্তিশালী করে থাকে।" [সহীহ বুখারী: ৪৮১]

এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একটি আরেকটির সাথে প্রবেশ করালেন, বিল্ডিং নির্মাণের সময় যেমন একটি ইটের উপর আরেকটি ইট রাখা হয়, তেমন।

আপনি একটি ইট দিয়ে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারবেন না। বিল্ডিং নির্মাণ করতে গেলে আপনার অনেকগুলো ইটের প্রয়োজন। সবগুলো ইট পারস্পরিক জোড়া লাগালে তবেই বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারবেন।

মুমিনের উদাহরণও তেমন। একটি ভালো কাজ করতে গেলে সবাইকে একত্র হতে হবে। আলাদা আলাদা থেকে কোনো বড়ো কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তোমরা সৎকাজ ও দ্বীনদারিতায় একে অন্যের সাহায্য করো।" [সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ২]

ইসলাম কোনো ব্যক্তিগত ধর্মের নাম নয়। ইসলাম সামষ্টিক, সামাজিক ধর্মের নাম। আপনি যদি মনে করেন একাকী নামাজ-রোজা পড়ে দ্বীনদার হয়ে যাবেন, এটা ভুল ধারণা। আপনাকে জামআতের সাথে থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আল্লাহর রহমতের হাত মুসলিমদের জামআতের ওপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি জামআত থেকে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সাথী হয় এবং তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়।" [সুনানে আন-নাসাঈ:৪০২০]

আমরা মুসলিম জামআতের সাথে বসবাস করবো, জামআত বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। জামআত বিচ্ছিন্ন হলে তার পরিণতি কী হয় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উদাহরণের মাধ্যমে জানিয়ে দেন-

"পালের যে মেষটি দল থেকে আলাদা হয়ে যায় অথবা যেটি খাবারের সন্ধানে দূরে সরে পড়ে বা যেটি অলসবসত এক কিনারায় পড়ে থাকে, নেকড়ে সেটিকে শিকার করে নেয়। তোমরা কখনো জামআত ছেড়ে গিরিপথে চলে যাবে না, জামআতবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের সাথে থাকবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ২১৬০২]

যখন আমরা মুসলিম জামআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তখন আমাদের ঈমানে ঘাটতি দেখা দেয়, আমাদের সন্তানদের ঈমানে ঘাটতি দেখা দেয়। আপনার সন্তানকে আপনি মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করুন। তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যান, মসজিদের পরিবেশের সাথে, মুসলিম জামআতের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

জামআত মানে শুধু মসজিদে নামাজের জামআত মনে করলে হবে না। ভালো কাজের জন্য যখন আপনারা একত্রিত হবেন, সেটাই জামআত। যেমন: গরীব-অসহায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনারা একত্রিত হলেন। এটাও জামআত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুমিনরা বৃহত্তর স্বার্থে একত্রিত হয়, এটা আল্লাহর সুন্নাহ। নতুবা বৃহত্তর স্বার্থ বলতে কিছু থাকতো না।

মুসলিম ইতিহাসের এমন কোনো আলেম নেই, এমন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যিনি একাকী বা গুহায় বসবাস করে জীবন কাটান। আপনাকে অবশ্যই সমাজে বসবাস করতে হবে, সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে।

আপনি কোনো একটি কাজ পছন করেন, সেই কাজটি করতে চান। সেই কাজে যারা দক্ষ তাদের পরামর্শ নিন, তাদের জামআতে শরীক হোন। আমরা যখন কোনো কাজে একত্র হই, তখন আমাদের শক্তি বেড়ে যায়। আমি হয়তো একটি কাজে দক্ষ, আরেকটি কাজে অদক্ষ। কিন্তু, আমার সহযোগি হয়তো সেই কাজ খুব ভালোভাবে পারে।

একজন ভালো লিখতে পারে, আরেকজন ভালো ডিজাইন করতে পারে। দুজন যখন একত্রিত হবে, তখন ভালো ডিজাইনের সাথে একটি ভালো লেখা প্রকাশিত হবে।

আপনি মানুষের সাথে মিশলে অবশ্য মানুষ আপনাকে কষ্ট দিবে, কটু কথা শুনা লাগতে পারে। তারমানে এই না যে, আপনি মানুষের সাথে মেশা বন্ধ করে দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে, সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে না।” [সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০৩২]
আপনি মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে মানুষ আপনাকে কষ্ট দিবে, সেই কষ্টে ধৈর্যধারণ করলেও সওয়াব পাবেন। আপনি ঘরে একা একা পড়ে থাকার আর কোনো সুযোগ রইলো না। আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে, মানুষের সাথে মিশতে হবে, কথা বলতে হবে, একজনের বিপদে পাশে দাঁড়াতে হবে, ভালো কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

অন্যের দোষ গোপন রাখা

মুমিনের একটি গুণ হলো সে অন্যের দোষ গোপন রাখে। একজন মুমিন অন্যের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় না, সে নাটকীয়তার আশ্রয় নেয় না। এটাকে আরবিতে বলা হয় ‘সিতির’।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:
“নিশ্চয়ই যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” [সূরা আন-নূর ২৪:১৯]
আল্লাহ আরো বলেন:
“মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে কারো ওপর যুলুম করা হলে সেটা ভিন্ন কথা।” [সূরা আন-নিসা ৪: ১৪৮]
সাধারণত আল্লাহ পছন্দ করেন না মন্দ কথা ছড়িয়ে পড়ুক, মন্দ কথার প্রচারণা, মন্দ কাজের প্রচারণা। তবে, কারো ওপর যুলুম করা হলে সে বিচারের জন্য এটা বলতে পারে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এরকম অসংখ্য ঘটনা দেখা যায়। সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে অপবাদের ঘটনা। যারা গুজব রটিয়েছিলো, তাদেরকে ব্যাপারে যেমন আল্লাহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, তেমনি বাকিদের ব্যাপারে বলেন-
“এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেনো নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলেনি- এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ?” [সূরা আন-নূর ২৪: ১২]
আল্লাহ দোষ-ত্রুটি গোপন করতে পছন্দ করেন। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো- ‘আস-সিত্তির’; যার মানে- যিনি দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪০১২]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো মাঈয আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যিনা করেন। যিনা করার পর তিনি অনুতপ্ত হন, শাস্তি পেতে

চান। পরামর্শের জন্য যান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ তোমার পাপ গোপন রেখেছেন, এখন তুমি নিজে তোমার পাপ গোপন রাখো।"

অতঃপর তিনি যান তাঁর বন্ধু হাযযাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। হাযযাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মাঈয আসলামীকে নিয়ে যান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। মাঈয নিজের পাপের কথা কয়েকবার বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যিনার শাস্তি দেন। শাস্তি দেবার পূর্বে তিনি মাঈযকে দোষারোপ না করে বরং হাযযালকে দোষারোপ করেন। কারণ, হাযযাল চাইলে মাঈয রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাপ গোপন রাখতে পারতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"হে হাযযাল! যদি তুমি এই খবরটি গোপন রাখতে, তাহলে তা তোমার জন্য ভালো হতো। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ১৫০৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৭৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযযাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অন্যান্য সাহাবীদেরকে শেখালেন যে, তোমরা যদি কারো বড়ো কোনো পাপ গোপন রাখো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের পাপ গোপন রাখবেন। কারো পাপ বলে বেড়ানোর চেয়ে সেটা গোপন রাখাটা বরং তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কোনো বান্দা যদি অপর কোনো বান্দার দোষ-ত্রুটি দুনিয়াতে গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি কিয়ামতের দিন গোপন রাখবেন।" [সহীহ মুসলিম: ৬৪৮৯]

আপনি যদি জানতে পারেন, আপনার কোনো মুসলিম ভাই বা বোন একটি পাপ করেছে, সেটা সে আপনার সাথে শেয়ার করেছে বা আপনি তাকে সেটা করতে দেখেছেন, তাহলে তার দোষ গোপন রাখুন। আপনি যদি তার সেই দোষ, তার সেই পাপটি গোপন রাখেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ যদি আপনার দোষ গোপন রাখেন, তাহলে আপনার স্থান হবে জান্নাতে।

মুনাফিকের কাজ হলো অন্যের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো। কাউকে কোনো পাপ করতে দেখলে তারা সেটাকে ক্যামেরাবন্দী করে, পুরো দুনিয়াকে সেই পাপ দেখায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাজের ব্যাপারে সতর্কবার্তা জানিয়ে দেন-

"হে যেসব লোক, যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছো কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করবে না ও দোষত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ, যারা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন।" [সুনানে আবু দাউদ:৪৮৮০]

এই হাদীসটি খুবই ভীতিপ্রদর্শনকারী হাদীস। যারা সারাক্ষণ অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তারা মুখে ঈমান আনলেও তাদের অন্তর ঈমান আনেনি।

আমরা বর্তমান সময়ে দেখতে পাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও টিভি চ্যানেল সারাক্ষণ অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করছে। কোন সেলিব্রিটি কখন কী করেছে সেটা তাদের আলোচনার

বিষয়। মিডিয়ার এমন আলোচনা আমাদের মুসলিম সমাজেও প্রভব ফেলেছে। ফলে, মুসলিমরা তাদের মূল বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে তারাও অন্যদের সাথে দোষ-ত্রুটি খোঁজায় লিপ্ত।

আমরা প্রত্যেকেই জীবনে কোনো না কোনো পাপ করেছি। প্রত্যেকেই ভুল করেছি। ঠিক তেমনি, আমরা কাউকে পাপ করতে দেখেছি।

এক্ষেত্রে ইসলামি শরীয়ত আমাদেরকে বলে, আমাদের নিজেদের গোপন পাপ যেন আমরা গোপন রাখি এবং অন্যের গোপন পাপও যেন গোপন রাখি। কাউকে পাপ করতে দেখলে অন্যকে বলার আগে তাকে বলতে পারি, "ভাই, আপনি যেটা করছেন, এটা তো পাপ। প্লিজ, এটা থেকে ফিরে আসুন। আল্লাহর কাছে তাওবা করুন।"

তবে, কেউ যদি কারো সাথে যুলুম করে, তখন আপনি সেই যুলুমের কথা বলতে পারেন। যেমন:কাউকে যদি নিয়মিত চুরি করতে দেখেন, অন্যের অধিকার হরণ করতে দেখেন, তখন সেটা জনসম্মুখে বলতে অসুবিধা নেই। কেউ যদি আপনার সাথে যুলুম করে, তাহলে আপনি সেটা বলতে পারেন।

তবে, সাধারণ নিয়ম হলো গোপ পাপকে গোপন রাখা। আমাদের সময় যেটা অনুপস্থিত।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমরা অন্যের দোষ বলে বেড়াই, এতে কী ক্ষতি হয়?

১। পাপীর তাওবা করা কঠিন হয়ে পড়ে:

আপনি যদি কারো গোপন পাপ প্রকাশ করে ফেলেন, তাহলে যে গোপন পাপ করেছে, তাকে নিয়ে সবাই হাসি-তামশা করে, সবাই ট্রল করে। অথচ এসব পাপ বাকিরা করে। যখন তাকে এক্সপোজ করা হয়, মনে হয় বাকিরা নিষ্পাপ। অথচ তার পাপ প্রকাশিত হয়েছে, বাকিদেরটা প্রকাশিত হয়নি। এতে করে সবার ট্রল তার ইগোতে লাগে, সে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে পারে না। সে এটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে নেয়।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ যদি আমাদের পাপগুলো গোপন না রাখতেন, তাহলে আমরা একসাথে বসতে পারতাম না।"

আমরা গোপনে যেসব পাপ করেছি, সেটা যদি সবাই জেনে যেতো, তাহলে কি আমরা একসাথে বসতে পারতাম? আল্লাহ যেহেতু আমাদের গোপন পাপ গোপন রেখেছেন, আমরা কেনো অন্যের গোপন পাপ গোপন রাখবো না?

২। নিজের অহংকার বেড়ে যায়:

যখন আপনি অন্যের পাপের ব্যাপারে কথা বলবেন, তখন কিছু সময়ের জন্য নিজেকে নিষ্পাপ ধরে নিবেন। আপনার মনে হবে, 'ঐ লোকটি তো খারাপ, পাপী'। অথচ এখা যাবে, এসব পাপ আপনি নিজেও করেন। অন্যের পাপ দেখে আপনি উৎসাহ নিয়ে প্রচার করছেন, কিন্তু নিজের পাপটা গোপন রাখতে চাচ্ছেন।

৩। পাপের কথার প্রচার হলে সেটা স্বাভাবিক হয়ে যায়:

আপনি যখন পাপের কথা প্রচার করবেন, তখন সমাজে পাপাচার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। একসময় পাপকে আর পাপ মনে হবে না। আমরা যদি বলতে থাকি 'অমুক মদ খায়, তমুক মদ খায়। অমুকের

গার্লফ্রেন্ড আছে, তমুকের বয়ফ্রেন্ড আছে’ তাহলে দেখা যাবে ১০-১৫% পাপে লিপ্ত। তাদের পাপের কথা জেনে বাকিরাও পাপে উৎসাহিত হবে। তারা ভাববে, অমুক করে, আমি করলে অসুবিধা কী? এজন্য গোপন পাপের কথা লুকিয়ে রাখাই ভালো।

৪। ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি তৈরি হবে:

একজনের কোনো গোপন পাপের কথা প্রকাশিত হলে দেখা যায় তাকে ছুঁড়ে ফেলা। তার যতো ভালো কাজ আছে, সবগুলো খারিজ করে দেয়া হয়। অথচ মানুষ মাত্রই ভালো-মন্দে। এমন কেউ নেই, যে একেবারে ভালো এবং এমন কেউ নেই যে একেবারে মন্দ।

আজকের আলোচনা শেষ করছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উৎসাহজাগানিয়া হাদীস দিয়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তিকে তার রবের নিকটবর্তী করা হবে। তারপর আল্লাহ তার উপর পর্দা ঢেকে দিবেন এবং তার পাপের ব্যাপারে তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার পাপ সম্পর্কে জানো? সে বলবে, হে আমার রব! আমি জানি। আল্লাহ বলবেন, তোমার এই পাপ দুনিয়াতে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ তোমার এই পাপগুলো আমি মাফ করে দিলাম।” [সহীহ মুসলিম: ৬৯০৮]

অন্যের সাথে হাসি মুখে কথা বলা

হাসিখুশি থাকা হলো মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন সারাক্ষণ গম্ভীর মুখে থাকতে পারে না। মাঝেমধ্যে সে হাসবে, আনন্দ করবে।

জারির ইবনে আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় বসবাস করতেন। তিনি বলেন:

“যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকাতেন, তখন তিনি মুচকি হাসতেন।” [সহীহ বুখারী: ৩০৩৫]

জারির ইবনে আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে যেতেন, দিনের অন্যান্য সময়েও হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর দেখা হতো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তাঁর দিকে তাকাতেন, হাসিমুখে তাকাতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন:

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে বেশি মুচকি হাসি দিতে আর কাউকে দেখিনি।” [জামে আত-তিরমিজি: ৩৬৪১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যেমন হাসিখুশি থাকতেন, তেমনি আমাদেরকেও হাসিখুশি থাকার উপদেশ দেন। অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলাকে যেন তুচ্ছ হিশেবে না দেখি সেজন্য তিনি সতর্ক করে বলেন-

"কোনো নেক আমলকে হীন মনে করো না; এমনকি হোক সেটা ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ।" [সহীহ মুসলিম: ৬৫৮৪]
আমরা যদি কারো সাথে হাসিমুখে কথা বলি, সেটাতেও সওয়াব হবে; সাদকার সওয়াব।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"প্রতিটি ভালোকাজই সাদকারূপে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা-সাক্ষাৎ করাও (সাদকার অন্তর্ভুক্ত)।" [জামে আত-তিরমিজি: ১৯৭০]
মাঝেমধ্যে আমি লক্ষ্য করি, যারা দ্বীনে ফিরে, দ্বীনে ফেরার পর রুক্ষ মেজাজের হয়ে যায়। তাদের মেজাজ সবসময় উত্তপ্ত থাকে, মুখে হাসি দেখা যায় না, সবসময় কেমন যেন রাগান্বিত, ধমকাধমকির মধ্যে থাকে। আমি জানি না তারা কোন সুন্নাহ পালন করে, এমন সুন্নাহ তারা কোন বইয়ে পেয়েছে! আমাদের ধর্ম আমাদেরকে বলে, আমরা যেন হাসিখুশি থাকি, অন্যের সাথে হাসিমুখে, আনন্দচিত্তে কথা বলি। কোনো ক্ষেত্রে রাগ দেখানো বা ধমক দেয়ার প্রয়োজন হলে না হয় ধমক দেবো, রাগ দেখাবো। কিন্তু, আমাদের সার্বক্ষণিক আচরণ হলো হাসিমুখে কথা বলা।
সাইকলজিস্টরা বলেন, হাসিখুশি থাকলে সেটা রক্তচাপ কমায়। হাসিখুশি হলো এমন একটি কাজ, আপনি হাসিমুখে থাকলে সেটার প্রভাব আপনার পাশের জনের ওপর পড়বে। অন্যজনও হাসিমুখে থাকবে। আপনি রাগান্বিত থাকলে আপনার পাশেরজনও আপনার রাগ দেখে রাগান্বিত হবে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝেমধ্যে অট্টহাসি হাসতেন। তিনি এমনভাবে হাসতেন, সাহাবীরা তাঁর মাড়ির দাঁত দেখতে পেতেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৩৫৯৫]
তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে হাসতেন না, যেভাবে হাসলে খারাপ দেখায়। ফজরের নামাজ পড়ে সাহাবীরা মসজিদে বসতেন। কেউ কেউ জাহিলিয়াতের সময়ে গল্প বলতেন, সবাই হাসতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাসিতে অংশগ্রহণ করতেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝেমধ্যে কৌতুক বলতেন, জোকস বলতেন। সাহাবীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও আমাদের সাথে কৌতুক করছেন?"
সাহাবীরা অবাক হতেন এই কারণে যে, রাসূলের মতো একজন ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তি কি তাদের সাথে কৌতুক করতে পারেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
"আমি কৌতুকচ্ছলে কখনো সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না।" [মুসনাদে আহমাদ: ৮৭০৮]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজা করতেন বটে, তবে মজাচ্ছলে মিথ্যা বলতেন না, কাউকে হেয় করতেন না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না।
একবার এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে অনুরোধ করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।"
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "ওহে! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না!"
এটা শুনে বৃদ্ধা কান্না শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানিয়ে দিলেন-

"তুমি বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কারণ জান্নাতে সবাই কুমারী হয়ে যাবে।" [শামায়েলে তিরমিজি: ১৭৯]

আরেকবার এক সাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি উট চান। রাসূলুল্লাহ তাকে বলেন, "আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দিচ্ছি।"

সাহাবী চাইলেন উট, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিতে চাইলেন উটনীর বাচ্চা। এটা শুনে সাহাবী বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার বললেন:

"প্রত্যেক উটই তো কোনো না কোনো উটের বাচ্চা!" [শামায়েলে তিরমিজি: ১৭৭]

যাহির রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের একজন বেদুইন ছিলেন। তিনি মাঝেমাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে হাদিয়া নিয়ে আসতেন। তিনি দেখতে কালো ছিলেন। তিনি চলে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন:

"যাহির আমাদের পল্লিবন্ধু আর আমরা তাঁর শহুরে বন্ধু!"

একবার বাজারে যাহির বেচাকেনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিরকে পেছন থেকে ঝাপটে ধরেন। যাহির নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলো না। যখন তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে পেছন থেকে আর কেউ নন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাপটে ধরেছেন তখন নিজের পিট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকের সাথে পিঠ মিলালেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে হাঁক দিলেন, "আমার এই গোলামটিকে কে কিনবে?"

যাহির রাদিয়াল্লাহু আনহু মন খারাপ করে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বিক্রি করলে কেবল অচল মুদ্রাই পাবেন!"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুঃখ বুঝতে পারলেন। তিনি যাহির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মানুষ তাঁকে মূল্যায়ন করে না, এটা ঠিক। কিন্তু, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

"কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও। আল্লাহ নিকট তোমার উচ্চমর্যাদা রয়েছে।" [শামায়েলে তিরমিজি: ১৭৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের সাথে মজা করতেন, তাঁদেরকে আনন্দিত করতেন বিভিন্ন কথা বলে, বিভিন্ন কাজ করে।

তবে, আমাদেরকে একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে।

আমরা যখন কারো সাথে মজা করবো, তখন লক্ষ্য রাখতে হবে সে কষ্ট পাচ্ছে কিনা। মজাচ্ছলেও এমন কথা বলা যাবে না, যা শুনলে আরেকজন কষ্ট পায়।

মজাচ্ছলে এমন কিছু করা যাবে না, যা দেখে আরেকজন ভয় পায়। যেমন: তেলাপোকা, বিছা, সাপ দেখিয়ে ভয় দেখানো ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী একবার একটি সফরে গেলেন। একজন সাহাবী ঘুমিয়ে ছিলেন। আরেকজন সাহাবী সেই ঘুমানো সাহাবীকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এটা করেন স্রেফ মজা করার জন্য। ঘুমানো সাহাবী ঘুম থেকে উঠলে কী ভাববেন? হয়তো ভাবতে পারেন তাকে কেউ বন্ধী করেছে বা কিডন্যাপ করেছে।

ঘুমন্ত সাহাবীকে বেঁধে ফেলার ফলে তিনি আচমকা ভয় পেয়ে যান। এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কানে পৌঁছে। মনে হতে পারে, একজন আরেকজনের সাথে মজা করে তো এমনটা করতেই পারেন। একজনকে ভয় দেখিয়ে তো বাকিরা আনন্দ পেলো। ১০ জনকে আনন্দ দিতে গিয়ে না হয় একজন ভয় পেলেন।

কিন্তু, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনাটি শুনার পর কঠিন হুঁশিয়ারি দিলেন। তিনি বললেন,

"কোনো মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।" [সুনানে আবু দাউদ: ৫০০৪]

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজে হাসিখুশি থাকবে, অন্যকে হাসিখুশি রাখবে। সারাক্ষণ রাগান্বিত মুখ নিয়ে বসে থাকলে হবে না। মাঝেমধ্যে মানুষের সাথে মজা করতে হবে।

সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ হাসিরত অবস্থায় দেখেছিলেন। সেটা ছিলো তাঁর ইন্তেকালের কয়েকদিন আগের ঘটনা।

রাসূলের জীবনী থেকে আমরা শিখতে পারি যে, আমাদেরকেও হাসিখুশি থাকতে হবে। আমরা যতো উঁচু পদের অধিকারী হই না কেনো, যতো টাকাওয়ালা হই না কেনো, যতো মর্যাদাবান হই না কেনো, হাসিমুখে থাকতে হবে।

অন্যের ব্যাপারে সুধারণা রাখা

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে অস্পষ্ট কথাগুলোকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করে। আমারা প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সাথে কথা বলি, দেখা সাক্ষাৎ করি, মেইল আদান-প্রদান করি। এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ এমন কথা বলতে পারে, যে কথার নানান অর্থ হতে পারে। একজন মুমিন এসব অস্পষ্ট কথাগুলোর নেতিবাচক অর্থ দাঁড় করায় না।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ, কোনো কোনো অনুমান পাপ।" [সূরা হুজুরাত ৪৯: ১২]

আপনি যখন কোনো ব্যাপারে বা কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা করেন, সেটা সত্য হতে পারে বা মিথ্যা হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দেন, আমরা যেন বেশিরভাগ অনুমান থেকে দূরে থাকি। তবে, কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন:

"তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা।" [সহীহ বুখারী: ৫১৪৩]

মনে করুন, আপনার বাসায় একজন বেড়াতে আসলো। সে চলে যাবার পর আপনি মোবাইল খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনি ধারণা করে নিচ্ছেন, মোবাইলটি সে চুরি করেছে। এটা আপনার আশেপাশের

কয়েকজনকে বললেন, তারপর যে বাসায় এসেছিলো, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মোবাইলটি কি দেখেছো?'

পরে দেখা গেলো দুদিন পর আপনার বালিশের নিচে মোবাইলটি বন্ধ অবস্থায় পেলেন। আপনি ভুলে গিয়েছেন যে, মোবাইলটি বালিশে ছিলো। ধারণার বশবর্তী হয়ে একজনের ব্যাপারে আপনি অপবাদ দিলেন, তাকে লজ্জা দিলেন; তার সাথে কি কখনো আবার ভালো সম্পর্ক হতে পারে?

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনায় দেখা যায়, যারা অপবাদ রটিয়েছিলো তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। যারা অপবাদ রটিয়েছিলো, তাদেরকে ব্যাপারে যেমন আল্লাহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, তেমনি বাকিদের ব্যাপারে বলেন-

"এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেনো নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলেনি- এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ?" [সূরা আন-নূর ২৪: ১২]

এই আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ঘটনাটি শুনার পর সাহাবীগণ কেনো আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করেননি। তারা কেনো মন্দ ধারণা করেন?

উম্মে আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে যেসব কথা বলাবলি হচ্ছে সেগুলো শুনছেন?"

আবু আইয়ূব আনসারী স্ত্রীর এমন প্রশ্ন শুনে তার অবস্থান জানিয়ে দিলেন, "হ্যাঁ, শুনলাম। তবে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।"

এটা বলে তিনি উদাহরণ দিলেন।

"আচ্ছা উম্মে আইয়ূব! বলো তো, তুমি এমন কাজ করতে পারতে?"

এটা শুনে উম্মে আইয়ূব বললেন, "নাউজুবিল্লাহ! না না, এমন কাজ আমি করতেই পারি না। এটা আমার জন্য অসম্ভব।"

আবু আইয়ূব স্ত্রীকে বুঝালেন, "দেখো, তোমার চেয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা শতোগুণে উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্না। তাহলে তিনি এমন কাজ কিভাবে করতে পারেন?" [তাফসীর ইবনে কাসির, সূরা আন-নূরের ১২ নাম্বার আয়াতের তাফসীর]

আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন পদ্ধতির মাধ্যমে শেখালেন, কোনো গুজব প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত একজন মানুষের ব্যাপারে কিভাবে সুধারণা করতে হয়। নিজের স্ত্রীর উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন, যেখানে তুমি এমন কাজ করতে পারো না সেখানে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিভাবে এমন কাজ করতে পারেন?

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কিভাবে অন্যের ব্যাপারে সুধারণা রাখবো?

১। কে আপনাকে নিয়ে কী বললো সেটা ভুলে যান:

কেউ যদি কোনো কথা বলে, সেটাকে নিজের ওপর নিয়ে নেবেন না। আগে কথাটি পরিষ্কারভাবে শুনুন। কেউ যদি বলি, 'গরু চোরেরা সাবধান' আপনার বংশের কেউ যদি গরুর চোর থাকে, তাহলে সেটা শুনে রাগ করার কিছু নেই। কথাটি সাধারণ কথা, সাধারণভাবেই রাখুন। নিজের ওপর টেনে নিলে বুঝা যাবে, কথাটির সাথে আপনি প্রাসঙ্গিক।

অনুমান অনেক ক্ষেত্রে এমন কিছু বুঝায়, যে অনুমান করে, সে একটি জিনিস বুঝে, যে কথাটি বলে সে আসলে সেটা বুঝায়নি।

আপনি যদি মনে করেন সবাই বিপথগামী হয়ে গেছে, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে, আদতে দেখা যাবে সবাই ঠিক আছে; আপনিই বিপথগামী হয়ে গেছেন।

এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কোনো ব্যক্তির ঈসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ এড়িয়ে চলা।" [জামে আত-তিরমিজি: ২৩১৮]

২। ভালো ধারণার চেষ্টা করা:

কারো কোনো কথা শুনে যদি মনে হয় কথাটি সে আপনার উদ্দেশ্যে বলেছে, আপনাকে আঘাত করেছে, তাহলে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে ধরে নিন সে এই উদ্দেশ্যে বলেনি। কথাটির পেছনে তার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে যা আপনি বুঝতে পারছেন না।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

"তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে এমন কিছু যদি শুনো যা তোমাকে কষ্ট দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তুমি সত্তরটি অজুহাত দেখাও। যদি তা না পারো, তাহলে ধরে নাও তার কাছে হয়তো এর কোনো ব্যাখ্যা আছে যা আমি জানি না।" [ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান: ৭৮৫৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এরকম একটি ঘটনা দেখা যায়। এক সাহাবী তাঁর কাছে এসে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী একজন কালো সন্তান প্রসব করেছে। অথচ আমি কালো নই!"

সেই সাহাবী যা বুঝাতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট। তিনি স্ত্রীর ব্যাপারে সন্দেহ করেন। তাঁর সন্দেহের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করেন, "তোমার কাছে কি কোনো উট আছে?"

সাহাবী বললেন, "হ্যাঁ, আমার কাছে উট আছে।"

"সেগুলোর রঙ কী রকম?"

"লাল রঙের।"

"তাতে কালো (মেটে) রঙের উট কি আছে?"

সাহাবী বললেন, "হ্যাঁ, কালো রঙের উটও আছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, "এই কালো রঙ কোত্থেকে আসলো?"

সাহাবী বললেন, "সম্ভবত তা পূর্ববর্তী বংশধারা থেকে এসেছে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

"তোমার এই কালো সন্তানটিও সম্ভবত পূর্ববর্তী বংশধারা থেকে এসেছে।" [সহীহ মুসলিম: ৩৬৫৮]

সাহাবী এসেছিলেন স্ত্রীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা নিয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব একটি উদাহরণ দিয়ে সাহাবীর সংশয় দূর করেন।

৩। যাচাই করে নেয়া:

কোনো বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ দেখা দিলে সেটা যাচাই করে নিন। আপনি মনে করেছেন কেউ আপনাকে নিয়ে কিছু বলেছে। এটা মাথা থেকে সরাতে পারছেন না। সেই মুহূর্তে আপনি সরাসরি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'সেদিন যা বলেছিলে, তার ব্যাখ্যা একটু বলো। আমি আসলে বুঝিনি'। তখন আপনি তাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিবেন। এতে করে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর হবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও।" [সূরা হুজুরাত ৪৯: ৬]

আপনার কাছে যে কেউ যেকোনো সংবাদ নিয়ে আসলে আগে তা যাচাই করে নিন। 'চিলে কান নিয়ে গেলো' শুনে চিলের পেছনে ছুটবেন না। আগে হাত দিয়ে দেখেন, আপনার কান ঠিক আছে কিনা। কারো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে তথ্যটি খুব ভালোভাবে যাচাই করে নিন। বিভিন্ন উৎস থেকে জানার চেষ্টা করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে দেখা যায়, তিনি কোনো তথ্য শুনার পর কারো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তাকে কথা বলার সুযোগ দিতেন। তাকে নিজেকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ দিতেন, কারণ জানার চেষ্টা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এরকম একটি ঘটনা দেখতে পাই। মক্কা বিজয়ের পূর্বে একজন বদরী সাহাবী মুসলিমদের মক্কা অভিযানের সংবাদ চিঠি লিখে মক্কায় জানিয়ে দিতে চান। তাঁর নাম ছিলো হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে, বিশ্বাসঘাতকা। তিনি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মক্কায় আগাম সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। একজন মহিলার কাছে চিঠিটি দেন। মহিলা চিঠিটি নিয়ে মক্কার পথে রওনা দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী মারফত খবরটি জানেন। তারপরও আলী ইবনে আবি তালিব ও যুবাইর ইবনে আবু বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে পাঠালেন চিঠিটি উদ্ধার করতে। চিঠি উদ্ধারের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, তাঁর পরিবার মক্কায় আছে। তিনি কুরাইশদেরকে আগাম সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন এই আশায় যে, মক্কায় আক্রমণ হলে তারা যেন তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা দেয়।

হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিঠি প্রেরণের কারণ জানার আগ পর্যন্ত মনে হতে পারে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কিন্তু, কারণ বলার পর মনে হয় তিনি আসলে তাঁর পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তা করে চিঠি পাঠিয়েছেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করে দেন। [সহীহ বুখারী: ৬৯৩৯, সীরাত ইবনে হিশাম: ৪/৩৭-৩৮, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৪/৪৮৮-৪৮৯]

কেউ যদি কোনো কিছু করে তাহলে তাকে শাস্তি দেবার আগে তার কাছ থেকে কারণ জেনে নিতে হবে। কারণ শুনার পর কারণটি যথাযথ হলে তাকে ক্ষমা করা যায়। উপরের ঘটনাটি এক্ষেত্রে একটি প্রমাণ।

আমরা সবাই ভুল করি। যেহেতু সবাই ভুল করি, সেহেতু অন্য কেউ ভুল করলে তার ভুলকে আমলে নিতে হবে। তাকে সুযোগ দিতে হবে, শাস্তি দেবার মতো ভুল হলে শাস্তি দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন মদ্যপায়ী। তাঁর নাম ছিলো আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। প্রায়ই মদপানের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। একবার তাকে শাস্তি দেবার সময় আরেকজন সাহাবী বললেন, "হে আল্লাহ! তার উপর আপনার লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতোবার যে আনা হলো!"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীর এমন উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন:

"তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসে।" [সহীহ বুখারী: ৬৭৮০]

একজন মদ্যপায়ী সাহাবীর ভালো গুণের প্রশংসা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন, তেমনি মদপানের জন্য তাকে শাস্তি দেন। অন্যরা তাকে লানত দিতে চাইলে তিনি সেই সাহাবীর পক্ষে কথা বলেন। কারণ, সেই সাহাবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।

মাঝেমধ্যে কেউ আমাদেরকে এমন কোনো কথা বলতে পারে, সেই কথাকে নেতিবাচকভাবে নিলে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে, মনোমালিন্য হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমরা চাইলে কথাগুলোকে ইতিবাচকভাবে নিতে পারি বা এড়িয়ে যেতে পারি। এতে সম্পর্ক রক্ষা পায়।

তবে, এটাকে অন্য কেউ যেন 'দূর্বলতা' না ভাবে, সেই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ক্ষমাশীলতাকে কেউ সরলতা ভেবে যেন সুযোগ নিতে না পারে।

কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন:

"প্রকৃত মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।" [সহীহ বুখারী: ৬১৩৩]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন 'বেশিরভাগ ধারণা পাপ'; আল্লাহ কিন্তু বলেননি 'সকল ধারণা পাপ'। কেউ আমাদের সাথে অনবরত দুর্ব্যবহার করে গেলে, তার কাছ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকবো।

ইসলাম ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা

মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- সে তার ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করে। সে তার ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতায় থাকে না। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, আমি মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য বলেছি বিনয়, এখন যদি বলি আরেকটি বৈশিষ্ট্য গর্ব করা, তাহলে কি দুটো বৈশিষ্ট্য বিপরীত হয়ে গেলো না?

না, এই দুটো বৈশিষ্ট্য পরস্পর বিপরীত না। মুমিন যখন নিজের ধর্ম নিয়ে গর্ব করবে, তখন সে নিজেকে নিয়ে গর্ব করবে না। সে বলবে না, আমি অন্যের চেয়ে ভালো মুসলিম বা বেশি আমলদার। সে গর্ব করবে এই ভেবে যে, আমি যে ধর্মের অনুসরণ করি, সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সে বলবে, আল্লাহ আমাকে এমন এক ধর্মের অনুসারী বানিয়েছেন, যে ধর্ম তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। এই গর্বের কারণ সে নিজে না; বরং সে যা অনুসরণ করে তা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"যে সম্মান চায়, তার জানা উচিত, আল্লাহর জন্যই সকল সম্মান।" [সূরা ফাতির ৩৫:১০]

সকল সম্মান আল্লাহর কাছেই। এই সম্মান আল্লাহ কাকে দেন? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জানিয়ে দেন:

"সম্মান তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের।" [সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩: ৮]

সম্মানবোধ আর অহংকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম ধর্ম নিয়ে গর্ব করা, সম্মানিত মনে করা আর অহংকার করা এক না। আমি যখন ইসলাম নিয়ে গর্ব করবো, তার মানে দাঁড়ায়, আমি বলছি- আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, আমি সুমহান দ্বীনের অনুসরণ করছি, যে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন। এটা আমার কৃতিত্ব না। এটার জন্য আমি অহংকার করছি না, আমি বরং গর্ববোধ করছি।

এটার সাথে 'আমার' সম্পর্ক নেই, আমি কিসের অনুসরণ করছি সেটার সম্পর্ক। এই ধরণের গর্ববোধ, এই ধরণের আত্ম-সম্মান প্রত্যেক মুমিনের থাকা উচিত। কোনো মুমিন তার ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য নিজেকে অপমানিত করাটা শোভনীয় নয়।" [জামে আত-তিরমিজি:২২৫৪]

কেউ যদি কখনো আমাদের ধর্ম নিয়ে হাসি-তামশা করে, কেউ যদি ধর্মের অবমাননা করে, তাহলে আমরা অবশ্যই কথা বলবো। কেউ ধর্ম নিয়ে খোঁটা দিলে একজন মুসলিম লজ্জিত হতে পারে না। কারণ, সে তার ধর্ম নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। সে প্রজ্ঞার সাথে এসব অপপ্রচারের জবাব দিবে।

অনেকেই বিদেশে যাবার জন্য নিজের নাম, সন্তানের নামের সাথে ইসলামি নাম রাখতে হীনমন্যতায় ভুগে। তারা মনে করে, যদি ইসলামের কোনো নিদর্শন থাকে, তাহলে যদি ঐ দেশে ঢুকতে না দেয়? দাড়ি রাখার কারণে মানুষ যদি 'জঙ্গি' বলে এই ভেবে অনেকেই দাড়ি রাখতে ভয় পায়। নামাজ পড়লে স্যার যদি কিছু মনে করেন, অফিসের বস যদি কিছু মনে করেন এই ভয়ে কেউ কেউ নামাজ পড়া বাদ দিয়ে দেয়।

কারণ, তারা তাদের দ্বীনের চেয়ে মানুষকে বেশি মূল্য দেয়। তারা দ্বীনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী নয়। দ্বীনের বিধি-বিধান মানার ব্যাপারে তারা গর্ববোধ না করে বরং লজ্জাবোধ করে। এই ধরনের মনোভাব কোনো মুমিনের হতে পারে না।

রাসূল-সাহাবীদের জীবনী পড়লে আমরা এমন দৃশ্য দেখতে পাই। তাঁদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে, নামাজের সময় ময়লা-আবর্জনা তাঁদের ওপর ফেলা হয়েছে, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক সবদিক থেকে নির্যাতন করা হয়েছে; তবুও তারা দ্বীনের ওপর অটল ছিলেন। তাঁদেরকে কেউ ঠলাতে পারেনি।

আমাদের সময় দেখা যায়, অনেকেই তার দেশ নিয়ে গর্ববোধ করে, তার দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে। একটা জিনিস আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে- আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় হলো আমরা মুসলিম। বাকি সকল পরিচয় হলো মুসলিম পরিচয়ের পরের পরিচয়।

কেউ বলতে পারেন, তাই বলে কি আমরা দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করবো না?

হ্যাঁ, করবেন। তবে, সেটা শর্তযুক্ত। ইসলাম যতোটুকু আপনাকে অনুমতি দেয়, ততোটুকু। মনে করুন বাংলাদেশে পদ্মার ইলিশ পাওয়া যায়। এই ইলিশ খেতে এতো সুস্বাদু, পৃথিবীর অনেক জায়গার ইলিশ খেয়ে আপনি এতো মজা পাননি। আপনি এজন্য গর্ববোধ করতে পারেন যে- আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ আমাকে এমন এক দেশে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন, যে দেশের ইলিশ পৃথিবীর সব দেশের ইলিশের চেয়ে সুস্বাদু।

কিন্তু, আপনি যেই মুহূর্তে আরেকটি দেশের মানুষের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে করবেন, একজন মানুষ আরেকটি দেশে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তাকে আপনার চেয়ে হীন মনে করবেন, তখন সেটা সমস্যাজনক। মনে করুন, আপনি মনে করেন, পাকিস্তানের একজন মানুষ পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে বলে খারাপ বা সৌদি আরবের কেউ যদি মনে করে একজন মুসলিম বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সে খারাপ মুসলিম; তাহলে এটা বর্ণবাদী মনোভাব। আপনি যদি মনে করেন, আপনার গায়ের রঙের কারণে আপনি নাইজেরিয়ার মানুষের চেয়ে উত্তম, তাহলে আপনি বর্ণবাদী। তেমনি, ইউরোপের কেউ যদি মনে করে তারা তাদের গায়ের রঙের কারণে পৃথিবীর বাকিদের চেয়ে উত্তম; এটাও বর্ণবাদী মনোভাব।

আমাদের একমাত্র শর্তহীন আনুগত্য ইসলামের জন্য। অন্য কোনো পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমরা শর্তহীন আনুগত্য দেখাবো না।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন জেরুজালেম যাচ্ছেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের চাবি তাঁর হাতে হস্তান্তর করা হবে। তিনি জীর্ণশীর্ণ জামা পরে যান। অন্যান্য সাহাবীরা তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন একটি ভালো জামা পরেন। কারণ, তিনি সমৃদ্ধশালী একটি অঞ্চলে যাচ্ছেন, সেখানে অনেক লোক আসবে তাঁর সাথে দেখা করতে। এমন পোশাক দেখে বাকিরা হয়তো তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারে।

সাহাবীদের পরামর্শ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আমলে নিলেন না। তিনি বললেন:

"আমরা ছিলাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করেছেন। সুতরাং, আল্লাহ আমাদেরকে যা দ্বারা সম্মান দান করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো জিনিস দ্বারা যখন আমরা সম্মান অনুসন্ধান করবো, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।" [মুস্তাদরাকে হাকীম: ৪৪৮১]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎকালীন সময়ের পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল, সবচেয়ে সম্মানিত অঞ্চল, সবচেয়ে সম্পদে ভরপুর অঞ্চলে যাবার সময় পোশাক পরিবর্তন করেননি। যে ধরনের পোশাক পরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ কাটান, সাহাবীদের যুগ কাটান, সেই ধরনের পোশাক পরে জেরুজালেম যান। কারণ, তিনি মনে করতেন পোশাকের সাথে সম্মানের সম্পর্ক নেই। সম্মানের সম্পর্ক ইসলামের সাথে।

ইসলাম নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগবেন না। ইসলাম এমন কোনো ধর্ম না, যে ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগবেন। আমরা যখন ইসলাম মেনে চলবো, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে সম্মান দান করবেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মান তালাশ করলে আমরা সম্মান খুঁজে পাবো না, আল্লাহ আমাদেরকে অপদস্থ করবেন।

নামাজের সময় আসলে আপনি নামাজে যান। আপনার ‘বস’ কী মনে করবেন, শিক্ষক কী মনে করবে এটা ভাবলে হবে না। যানবাহনে নামাজ পড়া লাগলে সেখানেই নামাজ শুরু করুন। আশেপাশের লোকজনকে লজ্জা পাবেন না।

আমি একবার এয়ারপোর্ট যাই এক জায়গায় যাবো বলে। সেটা আজ থেকে বিশ বছর আগের ঘটনা। আমি দেখলাম একজন মহিলা ‘ইয়োগা’ করছে। যাত্রা শুরুর আগে আধা ঘন্টা বিরতি পেয়েছিলো, এই বিরতি সে কাজে লাগাচ্ছে ব্যায়াম করে।

সেদিন আমি বুঝলাম, একজন মহিলা দুনিয়াবী একটি কাজ জনসম্মুখে করতে ভয় পাচ্ছে না, লজ্জা পাচ্ছে না। আমি কেনো শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনে জনসম্মুখে নামাজ পড়তে পারবো না?

এমন কোনো পরিস্থিতি যদি আসে, যেখানে রাস্তার পাশে আমাকে নামাজ পড়তে হবে, আমি দাঁড়িয়ে যাই। কে কী বলবে, কে কী মনে করবে সেটা ভাবলে চলবে না। তবে, কাজটা আমাকে প্রজ্ঞার সাথে করতে হবে। আশেপাশে কোনো সিকিউরিটি থাকলে তাদেরকে জানিয়ে দেবো, আমি নামাজ পড়ছি; অন্য কিছু মনে করার কারণ নেই।

আপনি নামাজ পড়লে অনেকেই এটা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে। আপনি ভাববেন না যে, আপনিই প্রথম। ইসলামের শুরু থেকে এটা চলে আসছে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“যখন তোমরা নামাজের দিকে আহ্বান করো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। এর কারণ এই যে, তারা নির্বোধ।” [সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ৫৮]

নির্বোধরা ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করবে, আপনার নামাজ পড়া নিয়ে সমালোচনা করবে। তাই বলে নির্বোধের কথায় পাত্তা দিলে চলবে না। কারণ, আমরা এমন এক ধর্মের অনুসরণ করি, যেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই ধর্ম নিয়ে আমরা গর্বিত।

লজ্জা : ঈমানের অঙ্গ

মুমিনের অন্যতম গুণাবলী হলো লজ্জাশীলতা। যার মধ্যে লজ্জাবোধ নেই, তার ঈমান নেই। একজন মুমিনের মধ্যে অবশ্যই লজ্জাবোধ থাকতে হয়।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে দুজন নারীর কথা উল্লেখ করেন। মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের দরবার থেকে পালিয়ে যখন মাদায়েন যান, তখন তাদেরকে দেখতে পান। নারীদের একজনের হাঁটার ধরণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

“অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বললো যে, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন।” [সূরা আল-কাসস ২৮: ২৫]

এই নারী মূসা আলাইহিস সালামের স্ত্রী হন। আল্লাহ তাঁর লজ্জাশীলতার প্রশংসা করেন। যখন তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলতে আসেন, তখন এমনভাবে হেঁটে আসেন, তাঁর হাঁটার মধ্যে লাজুকতা বুঝা যাচ্ছিলো। লাজুকতার এই গুণটি আল্লাহ পছন্দ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪০১২]
আমাদের সকল নবী লজ্জাশীল ছিলেন। প্রায় সকল নবীগণের স্ত্রী লজ্জাশীল ছিলেন। লজ্জাশীলতার গুণ প্রশংসনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“ঈমানের শাখা সত্তরটিরও বেশি। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।” [সহীহ মুসলিম:৫৮]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে ঈমানের সত্তরটির শাখার কথা বললেও ২-৩ টি শাখার কথা উল্লেখ করেন। তারমধ্যে অন্যতম হলো লজ্জা। তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা ও সর্বনিম্ন শাখার কথা উল্লেখ করেন; মাঝখাএর মধ্যে শুধুমাত্র লজ্জার কথা উল্লেখ করেন।
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যার মধ্যে লজ্জাবোধ নেই, তারমধ্যে ঈমান নেই। ঈমানের ফল হলো লজ্জা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের পাশ দিয়ে যান। এক সাহাবী তখন আরেক সাহাবীকে বললেন, “তুমি এতো লজ্জা পাও, তোমার এতো লজ্জা কিসের?”
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লজ্জাশীল সাহাবীর প্রশংসা করে বলেন:
“লজ্জাশীলতায় কল্যাণ ছাড়া কোনো কিছু নেই।” [সহীহ বুখারী: ৬১১৭]
প্রশ্ন হলো, লজ্জাশীলতা কী?
লজ্জাশীলতা হলো এমন কিছু থেকে বিরত থাকা, যেই কাজ করলে অন্য কেউ আপনার সমালোচনা করতে পারে। সে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ডেকে রাখতে চায়। সে অন্যের সামনে সেগুলো প্রকাশ করতে চায় না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“প্রথম যুগের নবী-রাসূলগণের উক্তিসমূহের মধ্যে যা মানবজাতি লাভ করেছে, তারমধ্যে একটি হলো- যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তাহলে তুমি যা ইছা তাই করো।” [সহীহ বুখারী: ৩৪৮৪]
অর্থাৎ, যেকোনো কিছু করার শেষ লাইন হলো লজ্জা। আপনি কোনো পাপ কাজ করতে পারছেন সেটা এজন্য যে, আপনি লজ্জার সীমা অতিক্রম করেছেন। মানুষ যখন লজ্জার সীমা অতিক্রম করে, তখন সহজে পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে।
আমরা এমন এক সময় বসবাস করছি, যখন মানুষের মধ্য থেকে লজ্জা-শরম একেবারে উঠে গেছে। এখন যদি কেউ লজ্জা পায়, তাকে নিয়ে মানুষ ঠাট্টা করে। কেউ যদি বলে, ‘আমি মেয়েদের দিকে তাকাই না’ তখন তার বন্ধুরা তার কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে। কারণ, যে বন্ধুটা লজ্জা পায়, তাকে তারা অদ্ভুত মনে করে! অথচ হবার কথা ছিলো তার উল্টো। সেই বন্ধু লজ্জা পায় বলে তার প্রশংসা করা উচিত ছিলো।
আমি আশির দশকে বড়ো হই। যারা টিভি দেখতো, আমার আম্মা-আব্বা তাদের সমালোচনা করতেন। তারা বলতেন, “আস্তাগফিরুল্লাহ! দেখো সে টিভি দেখছে।”
অথচ আমাদের সময় টিভি দেখা খাবার খাওয়ার মতো স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আমি চিন্তা করি, আমার সন্তানরা যা দেখছে, যেভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত হচ্ছে, তাদেরকে

নিয়ে ভয় হয়। আমার আব্বা-আম্মা ভয় পেতেন টিভি দেখা নিয়ে, আমরা ভয় পাচ্ছি তারচেয়ে বেশি কিছু নিয়ে।

এক প্রজন্মের মধ্যে এতো কিছু বদলে গেলো! সবার মধ্য থেকে লজ্জাবোধ উঠে গেলো। ছোটোবেলায় সিনেমা দেখতে গিয়ে গান আসলে টিভি বন্ধ করা হতো, কয়েকজন উঠে যেতো। এখন টিভিতে পরিবারের সবাই মিলে যা দেখে, সেটা কল্পনাও করা যায় না। আজ থেকে দুই যুগ আগের মানুষ সেটা ভাবতেও পারতো না।

আপনার ঘরে টিভি, মোবাইল না থাকলেও আপনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন না। সন্তানদেরকে নিয়ে যখন রাস্তায় হাঁটবেন, তখন বিলবোর্ডের দিকে চোখ যাবে। বিলবোর্ডের এমন দৃশ্য আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও ছিলো না।

হে মুসলিম! আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, আমরাই শেষ প্রজন্ম যারা লজ্জাশীলতাকে ধারণ করে আছি। আমরা যদি এক্ষেত্রে ভুল করি, আমরা যদি লজ্জাশীলতার চর্চা করতে না পারি, তাহলে মানবজাতির মধ্য থেকে লজ্জাশীলতা উঠে যাবে। পৃথিবীর অন্য কোনো মূলধারার ধর্মের অনুসারী আমাদের মতো লজ্জাশীলতার চর্চা করে। তাদের মধ্যে এমন লজ্জাবোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি মূলধারার ইহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যখন সবার মধ্যে লজ্জাশীলতা অনুপস্থিত, তখন আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। আমরা মানবজাতিকে দেখিয়ে দিতে হবে লজ্জাশীলতা বলতে কী বুঝায়। আমাদের সন্তানদেরকে লজ্জাশীলতা শেখাতে হবে। নিজেদের মধ্যে লজ্জাশীলতার চর্চা করলে তবেই সন্তানরা বুঝতে পারবে।

আরেকটি জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে। যারা অমুসলিম, তারা হয়তো লজ্জাশীলতার চর্চা করে না। কিন্তু, তাদের ফিতরাত তাদেরকে বলে দেয় যে, লজ্জাশীলতা ভালো গুণ। ফলে, কেউ যখন এমন গুণ দেখতে পায়, সেই গুণের প্রশংসা করে।

অমুসলিমকে দাওয়াত দেয়ার অন্যতম উপায় হলো লজ্জাশীলতার গুণ অর্জন করা। আপনি যখন এই গুণের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দিবেন, তারা সহজে সেই গুণের প্রশংসা করবে। কারণ, তাদের আশেপাশে এমন গুণ তারা দেখতে পায় না।

তারা হয়তো লজ্জাশীলতা নিয়ে হাসি-তামশা করতে পারে, কিন্তু হাসি-তামশা শেষ হলে ঠিকই তারা এই গুণের স্বীকৃতি দেবে।

আমি এমন একজন নারীকে চিনি, যিনি একজন মুসলিমের লজ্জাশীলতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দেখেন অফিসের সবাই তার সাথে ফ্ল্যার্ট করে, তাকে পটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু, একজন পুরুষ তাকে এড়িয়ে চলে। একবারও তার দিকে তাকায়নি। সেই নারী অবাক হলেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি আমার দিকে তাকান না কেনো?”

সেই পুরুষ বললেন, “আমি মুসলিম। ইসলাম আমাকে বলে নারীদের দেখলে দৃষ্টি নত করতে, তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলতে।”

মুসলিম পুরুষের এমন লজ্জাশীলতা দেখে সেই নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এখন ফুলটাইম ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করছেন। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি।

আপনি যা বলবেন, বুঝেশুনে বলুন। আপনি এমন কোনো কথা বলবেন না, যা শুনতে খারাপ লাগে, যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয় খোলামেলা আলোচনা করেননি। আল্লাহ বলেন 'যখন তারা রেস্টরুম থেকে বের হয়'; ভেতরে কী করে সেটা আল্লাহ বলেননি। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করো', স্বামী কিন্তু স্ত্রীদেরকে শুধু স্পর্শ করে না। কিন্তু, আল্লাহ এসব ব্যাপার খোলামেলা আলোচনা না করে মূল বার্তা দিয়ে দেন। এসব বিষয় আমরা যতো বেশি খোলামেলা আলোচনা করবো, অশ্লীলতার প্রচার ততো বেশি হবে। অশ্লীলতা থামানোর জন্য অশ্লীলতার প্রচার করতে হয় না, সেগুলোর কথা বিস্তারিত উল্লেখ করতে হয় না। যখন আপনি বিস্তারিত উল্লেখ করবেন, তখন লজ্জাশীলতার গুণটির কথা আপনি ভুলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবীগণ এগুলো আকারে-ইঙ্গিতে বলেছেন, বিস্তারিত বলেননি।

একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জানতে চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের নিয়ম বলে দেন যে, এক টুকরো কস্তুরী লাগানো নেকড়া দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করো। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করবো?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই প্রশ্ন তিনবার করা হলে প্রত্যেকবার তিনি একই উত্তর দেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলাকে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত বলেন। [সহীহ বুখারী: ৩১৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু শব্দ উহ্য রেখে তাকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহিলা বুঝলেন না। ফলে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বুঝান।

এ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লজ্জাবোধ বুঝা যায়।

আপনি কিভাবে পোশাক পরছেন তা থেকে আপনার লজ্জাবোধ বুঝা যায়। আপনি কতোটা ভদ্র, কতোটা শালীন সেটা বুঝার প্রথম লক্ষণ হলো আপনি কেমন পোশাক পরেছেন। নারী ও পুরুষ কেমন পোশাক পরবে সেটা নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত; যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" [সূরা আল-আরাফ ৭: ২৬]

আমরা একমাত্র প্রাণী, যারা পোশাক পরে। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী পোশাক পরে না। এই পোশাক আল্লাহ আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। আমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য পোশাক। পোশাক যদি লজ্জাস্থান ঢাকতে না পারে, তাহলে পোশাকের কোনো মূল্য নেই।

আমাদের বোনদের নিকট আমার অনুরোধ। আল্লাহ আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন, যা পুরুষদের দান করেননি। আল্লাহ আমাদেরকে এমন কিছু সুবিধা দান করেছেন, যা পুরুষদেরকে দেননি। আমাদেরকে এই সক্ষমতা দান করা হয়েছে। ফলে, আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। আপনি যখন লজ্জাশীল আচরণ করবেন, তখন কোটি কোটি টাকার কসমেটিক্স শিল্পকে আপনি তোয়াক্কা করছেন, এড়িয়ে চলছেন। আপনি অশ্লীলতাকে 'না' বলছেন।

তবে, লজ্জাশীলতাকে সবকিছুর জন্য ধরে নেবেন না। কিছু ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা শোভা পায় না। যেমন: কোনো কিছু জানতে। আপনি একটি বিষয় জানেন না, কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পাচ্ছেন। তারমানে এই না যে, লজ্জার কারণে সেটা জানতে চাইবেন না। আপনি বরং লজ্জা ভেঙ্গে ভদ্রভাবে সেটা জিজ্ঞেস করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি। এই হাদীসটি আমাদের সবার মুখস্থ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ " .

আনাস (রাঃ) , থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতিটি ধর্মেরই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'লজ্জাশীলতা'।[৩৫১৩]

সহীহাহ ৯৪০, রাওদুন নাদীর ৪১ ।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪১৮১

দয়া ও কোমলতা

মুমিনের একটি গুণ হলো দয়াশীলতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এই গুণ ছিলো। আল্লাহ এই গুণের প্রশংসা করে পবিত্র কুরআনে বলেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।" [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৫৯]

আল্লাহ আরো বলেন:

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আত-তাওবা ৯: ১২৮]

মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন কোমল হৃদয়ের অধিকারী হবে। সে মানুষের প্রতি দয়া দেখাবে। মানুষের কষ্ট দেখে সে কষ্ট পাবে।

মুহাদ্দিসগণ একটি হাদীসকে খুবই গুরুত্ব দেন। হাদীসের শিক্ষার্থীরা হাদীস শেখা শুরু করে এই হাদীসটির মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"আল্লাহ দয়ালুদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা যমিনে বসবাস করছে, তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রহমান হতে উদগত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক রাখে, আল্লাহ তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।" [জামে আত-তিরমিজি: ১৯২৪]

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের নাতি, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্র। একদিন জনসম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুমো দিলেন।

আরব, যেখানে একসময় বাবারা নিজেদের মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দিতো, সেই সমাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে তাঁর নাতিকে চুমো দিচ্ছেন? সন্তানকে আদর-স্নেহ তো মানুষ ঘরের মধ্যে করে। ঘরের বাইরে কি কেউ সন্তানকে এভাবে চুমো দেয়?

আকরা ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের এক সাহাবী দৃশ্যটি দেখে দারুণ বিস্মিত হলেন। দৃশ্যটি দেখে তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এরকম একটা সমাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে তাঁর নাতিকে চুমো দিলেন, এটা যেন তিনি মেনে নিতে পারছেন না। বাচ্চাকে চুমো দেওয়া যেন তাঁর কাছে দুর্বলতা-দুর্বলতা মনে হচ্ছে।

তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারও তো দশটা ছেলে আছে। কই, আমি তো কোনোদিন কাউকে চুমো দিইনি!"

সন্তানকে চুমো না দেওয়া যেনো খুব গর্বের একটা কথা! তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "মাল্লা ইয়ারহামু, লা ইয়োরহাম।" অর্থাৎ,

"যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।" [সহীহ বুখারী: ৫৯৯৭]

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে অন্যের প্রতি দয়া দেখায়। সে আল্লাহর কাছে যেমন দয়া প্রার্থী, তেমনি মানুষের প্রতি সে দয়া দেখায়; যাতে আল্লাহ তাকে দয়া করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। দ্বীন পালন যাতে কঠিন হয়ে না পড়ে, এজন্য তিনি অনেক ব্যাপারে জোরারোপ করেননি। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন সহজে দ্বীন পালন করতে পারে।

মিরাজের রাতে আল্লাহ উম্মতের ওপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। মুসা আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দেন, এতো বেশি নামাজ আপনার উম্মত আদায় করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের কথা চিন্তা করে আল্লাহর কাছে যান নামাজের ওয়াক্ত কমাতে। এভাবে তিনি নয়বার আল্লাহর কাছে যান। ফলে, আল্লাহ নামাজের ওয়াক্ত কমিয়ে পঞ্চাশ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত দেন। [সহীহ বুখারী: ৩৪৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাজের আগে তাদেরকে মিসওয়াক করার হুকুম করতাম।” [সহীহ বুখারী: ৮৮৭]
যদি দেখা যেতো, প্রত্যেক নামাজের আগে মিসওয়াক করা আবশ্যক হতো, তাহলে আমাদের কষ্ট হয়ে যেতো। আমাদের যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাজের আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দেননি। শরীয়ত যেন কঠিন না হয়, সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদেরকে বিলম্বে এশার নামাজ পড়তে নির্দেশ দিতাম।” [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৬৯০]
আমরা বর্তমানে এশার নামাজ রাত আটটার সময় পড়ি। শীতকালে সাতটার সময়। যদি এমন হতো, এশার নামাজ রাত বারোটায় পড়তে হতো, তাহলে আমাদের কষ্ট হতো। এশা-ফজর এই দুই নামাজের চিন্তায় ভালোভাবে ঘুম হতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কষ্টের কথা ভেবে তিনি এমন আদেশ আমাদেরকে দেননি, যা পালন করা আমাদের জন্য কষ্টকর।
তারাবীহর নামাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটানা তিনদিন মসজিদে যান, কিন্তু চতুর্থ দিন মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। সাহাবীরা তাঁর আশায় অপেক্ষা করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“শোনো, আমি জানতাম তোমরা সারারাত ধরে এখানে আছো, কিন্তু আমি আসিনি। কিন্তু, আমি এই নামাজ তোমাদের ওপর ‘ফরজ’ হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি (বিধায় বের হইনি)। আর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়তে পারো।” [সহীহ বুখারী: ২০১২]
একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলো। বেদুঈনরা সাধারণত শহরতলীর বাইরে থাকতো, শহুরে আদব-কায়দার সাথে তারা পরিচিত ছিলো না। তাদের স্বভাবেও অনেকটা রূঢ়তা ছিলো।
কিছুক্ষণ পর বেদুঈনটি মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে পেশাব করা শুরু করলো। যেই মসজিদে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন, যেই মসজিদটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে নির্মাণ করেছেন, সেই মসজিদে কিনা কোথাকার এক বেদুঈন পেশাব করা শুরু করলো?
সাহাবীরা রাগে অগ্নিশর্মা। তারা তেড়ে গেলেন বেদুঈনকে শায়েস্তা করতে। তাদের রাগ করাটা খুবই যৌক্তিক ছিলো। একে তো বেদুঈন মসজিদে ঢুকে তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেছে, তারউপর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিতিতে এমন গর্হিত কাজ শুরু করলো। এর শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে।
কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে থামালেন। তিনি বললেন, “থামো, থামো। তোমরা তাকে বাধা দিও না, তাকে ছেড়ে দাও।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনকে শান্তিমতো পেশাব করতে দিলেন। নিজে যেমন বাধা দিলেন না, তেমনি সাহাবীরা বাধা দিতে গেলে বরং তাঁদেরকেই বাধা দিলেন। কারণ, এমন অবস্থায় তার পেশাব আটকালে তার শারীরিক সমস্যা হতে পারে; পেশাব আটকে যেতে পারে।

ধীরে-সুস্থে পেশাব করা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বুঝালেন-

"এটা হলো মসজিদ। এখানে প্রসাব করা বা ময়লা আবর্জনা ফেলা যায় না; বরং এটা হলো আল্লাহর যিকির করা, নামাজ পড়া এবং কুরআন তেলাওয়াত করার জায়গা।" [সহীহ মুসলিম: ৫৪৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরেই নিলেন যে, বেদুঈনটি মসজিদের আদব সম্পর্কে জানে না। সে মসজিদকে আর-দশটা জায়গার মতো ভেবেছে। এজন্য তাকে শাস্তি না দিয়ে উল্টো জ্ঞানদান করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো বিষয়টি বুঝানোর পর চাইলে তাকে বলতে পারতেন, "তুমি যে ভুলটা করেছো, এবার সেটার প্রায়শ্চিত্ত করো। যেখানে পেশাব করেছো, সেখানে পানি দিয়ে ধুয়ে দাও।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাও করেননি। তিনি কী করলেন? সাহাবীদেরকে, যারা বেদুঈনের কাণ্ড দেখে বিরক্ত, রাগান্বিত, তাদেরকে বললেন-

"পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন সাহাবীদেরকে। এতো কিছুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনকে বকাঝকা না করে, বেদুঈনের প্রতি কঠোর আচরণ না করে বরং সাহাবীদেরকে বলছেন-

"তোমাদেরকে কোমল ও সুন্দর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; রূঢ়, কঠোর আচরণের জন্য পাঠানো হয়নি।" [সহীহ বুখারী: ২২০]

বেদুঈন সাহাবীদের রুঢ় আচরণ দেখেন, অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোমল আচরণ দেখেন। ফলে, তিনি সাহাবীদের জন্য দু'আ না করে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দু'আ করেন।

"হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করো ও মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি দয়া করো। এছাড়া আর কারো প্রতি দয়া করো না!"

বেদুঈনের এমন অদ্ভুত দু'আ থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি বাকিদের ওপর কতোটা বিরক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন:

"তুমি ব্যাপককে সীমিত করে দিলে।" [সুনানে আবু দাউদ: ৩৮০]

একবার এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে যিনা (Sexual intercourse) করার অনুমতি দিন!"

ঐ সাহাবী কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐরকম কোনো বন্ধু নন যে মন চাইলো আর যা ইচ্ছে বলে দিবেন। তা-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সাহাবীদের সাথে তখন বসা। বাকি সাহাবীরা তাকে ধমক দিলেন- "থামো, থামো"। অর্থাৎ, তোমার এত্তো বড়ো সাহস? তুমি কী বলছো এগুলো?

ঐ যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কতোটা ‘কমফোর্ট জোন’ হিশেবে চিন্তা করেছে ভাবা যায়? নিজের এমন ইচ্ছের কথাও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শেয়ার করছেন; যেসব বিষয়ের কথা সব বন্ধুও তার অন্য বন্ধুকে বলে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন- ‘‘আমার কাছে এসো।’’ সাহাবীরা তাকে ধমক দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে যেতে বললেন। এখন কি তিনি সজোরে তার গালে দুটো চড়-থাপ্পড় মারবেন? কিংবা সাহাবীদেরকে বলবেন, ‘একে ধরো, বেঁধে রাখো। শাস্তি দিয়ে দেখিয়ে দাও যে, এরকমটা কেউ করতে চাইলে কী পরিণতি হয়।’

না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনোটাই করলেন না। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি চিন্তা করুন আপনি সাহস করে আপনার শিক্ষককে সবার সামনে তার মেয়ের সাথে প্রেম/বিয়ের প্রস্তাবের পর তিনি কী রি-অ্যাক্ট করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি নিজের মায়ের জন্য এমনটা করতে পছন্দ করো?” অর্থাৎ তার সাথে অবৈধভাবে কেউ এটা করুক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সাহাবী বললেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝালেন যে, তুমি যার সাথে এমনটা করবে, সে তো কারো না কারো মা।

এবার জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার মেয়ের সাথে এমনটা হোক, সেটা তুমি পছন্দ করো?” যুবক সাহাবী আবারো ‘না’ বললেন। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝালেন যে, তুমি যার সাথে এমনটা করবে, সে তো কারো না কারো মেয়ে।

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোন, ফুফু, খালার উদাহরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করে একই সমাধান দিলেন যে, তুমি যার সাথেই এমনটা করো না কেনো, সে কারো না কারো মা, বোন, মেয়ে, খালা, ফুফু। তুমি যেমন নিজের কারো সাথে এমনটা হোক চাও না, তেমনি তারাও তো এমনটা চায় না।

বুঝানো শেষে তাঁর পবিত্র হাত যুবকের বুকে রাখলেন। এই ফিলিংসটাও একটু চিন্তা করুন। যে একটা পাপ কাজের জন্য এসেছিলো, তাকে বুঝানো শেষে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বুকে হাত রাখছেন। চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই হাত আমার-আপনার বুকে রাখছেন! কারণ, ঐ যুবকের অনুভূতি আমাদের প্রত্যেকেরই হয়। আমরা হয় বলি, নতুবা গোপন রাখি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকের বুকে হাত রেখে দু’আ করলেন, “হে আল্লাহ! আপনি তার গুনাহ মাফ করে দিন, তার হৃদয়কে পবিত্র করে দিন এবং তাকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করুন।” [মুসনাদে আহমাদ: ২২২১১]

সেদিনের পর থেকে যুবকটি কোনোদিন যিনার দিকে ঝুঁকেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ বুঝানো তার কতোটা কাজে লেগেছিলো একবার ভাবুন যে, তিনি যিনা করার কথাই মাথা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মুসলিমদেরকে দয়া দেখাতেন না। তাঁর সাথে শত্রুতা করতো না, এমন অমুসলিমদের প্রতিও তিনি দয়াশীল ছিলেন।

এক ইহুদি বালক ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন তার বাড়িতে। অসুস্থ ইহুদি বালকের মাথার পাশে বসলেন, তার মাথায় হাত রাখলেন।

সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতো। যার ফলে, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এধরনের মমতাবোধ ছিলো। তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটি মৃত্যুশয্যায়। বেশিক্ষণ হয়তো বাঁচবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।" ইহুদি বালকের সাথে ছিলেন তার পিতা। সে সারাজীবন ইহুদি ছিলো, এখন মৃত্যুর আগে পিতার সামনে পিতৃধর্ম পরিবর্তন করবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যবহার দিয়ে কতো মানুষের মন জয় করেছিলেন। তিনি একজন ইহুদির ঘরে গিয়ে তার ছেলেকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলছেন, স্বাভাবিকভাবে ইহুদি তো তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা! কিন্তু না। সেই ইহুদি ব্যক্তিটি তার ছেলেকে বলছে, "আবুল কাসেমের (নবিজীর কুনিয়াত) কথা মেনে নাও।"

বাবার কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে ছেলে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং পরবর্তীতে ইন্তেকাল করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদির ঘর থেকে বের হবার সময় বললেন:

"যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন।" [সহীহ বুখারী: ১৩৫৬]

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। এরইমধ্যে একটি লাশ তাঁদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি সাহাবীরাও দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীরা বুঝতে পারলেন লাশটি এক ইহুদির। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, "এটা তো এক ইহুদির লাশ?" অর্থাৎ, আপনি ইহুদির লাশের জন্য দাঁড়ালেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

"(তাতে কী?) সে কি মানুষ নয়?" [সহীহ বুখারী: ১৩১২]

মনে করুন, আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আমরা দেখতে পেলাম, মানুষজন লাশ নিয়ে যাচ্ছে। হোক সেটা মুসলিম বা অমুসলিমের লাশ। আমাদের উচিত হলো একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষকে সুযোগ দেয়া; যাতে লাশ নিয়ে সহজে যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়ার কারণে তায়েফ শহরটি আজও ঠিকে আছে। নতুবা তাঁকে যেদিন তায়েফের লোকজন কষ্ট দিয়েছিলো, আল্লাহ সেদিন সেই শহর ধ্বংস করে দিতেন।

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, "আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে তা আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা তাই হুকুম দিতে পারেন।"

পাহাড়ের ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিয়ে বললেন, “হে মুহাম্মদ! এই ব্যাপারটি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। আপনি যদি চান তাহলে আমি তাদের উপর দুটো কঠিন শিলা পাহাড় চাপিয়ে দেবো।”

প্রায় ঘন্টাখানেক আগে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্তাক্ত করে তাদের শহর থেকে বের করে দিয়েছে এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন। স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করছেন।

জবাবে রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“না, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাঁদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।” [সহীহ বুখারী: ৩২৩১]

কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছেন আর বলতে থাকেন:

“হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন; যেহেতু তারা জানে না।” [সহীহ বুখারী:৩৪৭৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র মানুষের প্রতি দয়াশীল ছিলেন না, তিনি পশু-প্রাণীদের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন।

একবার তিনি এক আনসারী সাহাবীর খেজুরের বাগানে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ একটি উটের দিকে তাঁর চোখ গেলো। উটটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে কাঁদতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন, উটটি কান্না থামায়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এই উটের মালিক কে?”

উটের মালিক ছিলেন এক আনসারী যুবক। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে রাসূলুল্লাহ বললেন:

“আল্লাহ যে তোমাকে এই নিরীহ প্রাণীটির মালিক বানালেন, এর অধিকারের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখো, একে কষ্ট দাও।” [সুনানে আবু দাউদ: ২৫৪৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র জীবের প্রতি দয়া করেননি, তিনি জড় পদার্থের প্রতিও দয়া দেখান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে মসজিদে একটি খেজুর গাছের মিম্বার ছিলো। নতুন মিম্বার আসার পর পুরনো মিম্বারটি সরিয়ে রাখা হয়। ফলে, খেজুর গাছের কাণ্ড কান্না শুরু করে! সাহাবীরা কান্না শুনতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন মিম্বার থেকে নেমে খেজুর কাণ্ডের ওপর হাত রাখেন। সেটিকে জড়িয়ে ধরেন। অবশেষে সেটা কান্না থামায়! [সহীহ বুখারী: ২০৯৫]

এই ঘটনা বর্ণনা করে হাসান আল-বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“এমনকি একটি খেজুরের কাণ্ড রাসূলের বিচ্ছেদে কান্না করেছে, আমরা কি তাঁর বিচ্ছেদে কান্না করবো না?”

আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বলে অন্যের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে। সে হোক মুসলিম, অমুসলিম বা প্রাণী। আপনার প্রতিবেশী কোনো অমুসলিম অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে তাকেও সহযোগিতা করতে হবে। বিপদে তার পাশে দাঁড়াতে হবে। গৃহপালিত প্রাণীর প্রতি আপনাকে দয়া প্রদর্শন করতে হবে, ঠিকমতো খাবার দিতে হবে।

আমাদের সময়ে কেউ কেউ বলে থাকে, 'মুমিন কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না, মুমিনকে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে হয়'। এটা ভুল কথা। যখন, যেখানে কঠোর হওয়া দরকার, আমরা সেখানে কঠোর হবো। কিন্তু, আমাদের স্বভাবত গুণ হওয়া উচিত কোমলতা। মুমিনের স্বভাবজাত গুণ কোমলতা, কঠোরতা নয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা কঠোর হবো, কিন্তু সার্বক্ষণিক কোমল আচরণ করবো।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল-আম্বিয়া ২১: ১০৭]

আল্লাহ হলেন রহিম-রহমান, তিনি তাঁর রাসূলকে মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ নিজে দয়ালু, তিনি দয়াশীলতা পছন্দ করেন। আমরা যদি আল্লাহর দয়া পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও মানবজাতির প্রতি দয়াশীল আচরণ করতে হবে।

যে মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞ, সে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ

তারা তৈরী করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। 'হে দাউদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ'[সূরা সাবা ৩৪: ১৩]

এই গুণটি মুমিনের অন্যতম গুণ। একজন মুমিন স্বভাবতই কৃতজ্ঞ থাকে। সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা তার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। কিন্তু, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, তাঁর খুব কম সংখ্যক বান্দাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, হাত-পা-চোখ দান করেছেন, রিযিক দেন, সেই আল্লাহর প্রতি মানুষ কিভাবে অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ।" [সূরা আল-ইনসান ৭৬: ৩]

কৃতজ্ঞতার আরবি হলো 'শুকুর', অকৃতজ্ঞতার আরবি হলো 'কুফর'। আল্লাহকে অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা যেমন কুফর, তেমনি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা বুঝাতেও কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আমাদের সামনে পথ খোলা। আমরা হয় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবো, নতুবা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার শুনলেন, এক লোক দু'আ করছে-

"হে আল্লাহ! আমাকে অল্প সংখ্যকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন!"

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "অল্পসংখ্যক মানে কী? কারা অল্পসংখ্যক?" তখন লোকটি খলিফাকে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান-

"আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।" [সূরা সাবা ৩৪: ১৩]

লোকটির বুদ্ধিমত্তা দেখে খলিফা বললেন, "সবাই আমার চেয়ে কতো বেশি জানে!" [মুসান্নাফে আবি শায়বা: ২৯৫১৪]

কৃতজ্ঞতাবোধের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা শুধু যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করবো, এমন না। মানুষের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করবো। যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, তাহলে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবো। যে পারে, সে দুটোই পারে। যে পারে না, সে একটিও পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاس" . َ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮১১]

একই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮১১]

আপনি যদি আল্লাহর ইবাদাত ভালোভাবে আদায় করেন, কিন্তু বান্দার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় না করতে পারেন, মানুষকে কষ্ট দেন; তাহলে কিন্তু এটার জন্য পরকালে জবাবদিহী করতে হবে। এটার উদাহরণ পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাদীস থেকে।

একবার একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক নারী অত্যধিক নামাজ, রোজা ও দানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু সে কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

"সে জাহান্নামী।"

সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরেকজন নারী কম রোজা রাখে, দানও কম করে এবং নামাজও কম পড়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। বলতে গেলে সে এক টুকরো পনিরই দান করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

"সে জান্নাতি।" [মুসনাদে আহমাদ: ৯২৯৮]

একজন মানুষ নিজেকে কিভাবে আল্লাহর ওলী দাবি করতে পারে, যে কিনা নিয়মিত নামাজ পড়ে, অথচ মানুষের সাথে প্রতারণা করে, কষ্ট দেয়? আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে গেলে অবশ্যই 'অলরাউন্ডার' হতে হবে। আল্লাহর ইবাদাত যেমন করতে হবে, মানুষের হকও আদায় করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা মূলত তিন প্রকার। সেগুলো হলো:

অন্তরের কৃতজ্ঞতা

জবানের কৃতজ্ঞতা

আমলের কৃতজ্ঞতা

১। অন্তরের কৃতজ্ঞতা:

অন্তরের কৃতজ্ঞতা হলো উপলব্ধি করা। আল্লাহ আপনাকে কেমন নিয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করেছেন, মানুষ আপনাকে কিভাবে উপকার করেছে, আপনার পাশে দাঁড়িয়েছে। যখন আপনি অনুভব করবেন এসব উপকারের কথা, তখন আপনা আপনি সবার ওপর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবেন।

আপনি যখন বাবা অথবা মা হন, তখন অনুভব করেন- 'সুবহানাল্লাহ! আমার মা-বাবা আমার জন্য কতো কিছু করেছেন'। বাবা-মা হবার আগ পর্যন্ত আপনি হয়তো ঐভাবে অনুভব করতে পারবেন না, আপনার মা-বাবা আপনার জন্য কী করেছেন। নিজের সন্তানকে যখন আদর করতে যাবেন, তখন মনে পড়বে আপনার শৈশবের কথা। সন্তানের মধ্যে শৈশবের আপনি'র ছায়া খুঁজবেন।

২। জবানের কৃতজ্ঞতা:

যদি আপনি অনুভব করেন যে, কেউ আপনার উপকার করেছে, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানান। তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আল্লাহ আপনাকে অনেক কিছু দান করেছেন, নিয়মিত 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলুন। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে করতে শেষ করতে পারবেন না। অনেক মানুষ আছেন, যারা নিয়মিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলেও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেন না। তারা মনে করেন, আমার বন্ধুকে বা আমার ভাইকে বা আমার আম্মা-আব্বাকে 'ধন্যবাদ, থ্যাংকিউ/জাজাকাল্লাহ' বলে কী হবে? তারা তো আমার আপনজন। আপনজনের সাথে আবার ফর্মালিটি কিসের?

এটা ভুল ধারণা। মানুষ স্বভাবগত প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে, তার প্রতি কেউ কৃতজ্ঞতা আদায় করলে তার ভালো লাগে। রিক্সা থেকে নেমে একদিন রিক্সাওয়ালা মামাকে বলে দেখুন- 'থ্যাংকিউ মামা' বা 'জাজাকাল্লাহু খাইরান মামা'; দেখবেন সেই রিক্সাওয়ালা আপনাকে সুন্দর একটি হাসি উপহার দিবে। কারণ, এভাবে কেউ তাকে কখনো বলে না। সে এটা শুনে অভ্যস্ত না। যখন সে আপনার মুখ থেকে শুনবে, আপনাকে সে পছন্দ করবে; আপনার জন্য সে দু'আও করতে পারে।

ঈদের সময় আপনার বাবা আপনাকে নতুন জামা কিনে দেন। তিনি কিন্তু আপনার কাছ থেকে 'ধন্যবাদ' শুনার জন্য এটা করেন না। কিন্তু, যদি আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তিনি খুশি হবেন। সামান্য একটি বাক্য দিয়ে যদি আপনি মানুষকে খুশি করতে পারেন, মানুষের মন জয় করে নিতে পারেন, তাহলে এটা বলতে আপনার আপত্তি কোথায়?

৩। আমলের কৃতজ্ঞতা:

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও।” [সূরা সাবা ৩৪: ১৩]

দাউদ আলাইহিস সালাম এতো লম্বা নামাজ পড়তেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নামাজের প্রশংসা করেন। দাউদ আলাইহিস সালাম এতো বেশি রোজা রাখতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রোজা রাখার প্রশংসা করেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দাউদ আলাহিস সালাম ও তাঁর পরিবারকে জানিয়ে দেন, তারা যেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দান করেন, সেগুলোর তিনি সদ্ব্যবহার করবেন এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে ‘জাজাকাল্লাহু খাইরান’ (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন), তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আদায় করলো।” [জামে আত-তিরমিজি: ২০৩৫]

কেউ যদি আমাদের কোনো উপকার করে, কোনো কিছু দিয়ে তার উপকারের প্রতিদান দিতে না পারলেও আমরা যেন কথার মাধ্যমে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“কাউকে কিছু দান করা হলে তার সক্ষমতা থাকলে সে যেন প্রতিদান দেয়। সক্ষমতা না থাকলে সে যেন প্রশংসা করে। কেননা, যে লোক প্রশংসা করলো, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। আর যে তা গোপন রাখলো, সে অকৃতজ্ঞ হলো। [জামে আত-তিরমিজি: ২০৩৪]

দুঃখজনক কথা হলো, আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করি না, আমাদের কাছের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করি না। পরিবারের গৃহিণী যখন ভালো রান্না করে, আমরা মুখ ফুটে বলি না ‘রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে, আল্লাহ তোমার/আপনার হাতে বরকত দান করুন’। আমরা লজ্জা পাই। কিংবা আমরা মনে করি, এটা বলে কী হবে? আমরা কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। কৃতজ্ঞতা শুধু কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, এমন না। কথার মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। আপনার ছোট্ট একটি প্রশংসা অনেকের সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে সাহাবীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কৃতজ্ঞতা আদায়ে তিনি কার্পণ্য করতেন না। আমরাও যেন কার্পণ্য না করি।

অনেকেই দেখবেন রামাদ্বানের শেষে ‘ঈদ মোবারক’ ম্যাসেজ দেয়। কেউ কেউ সেটা হোয়াটসঅ্যাপ ব্রডকাস্টের মাধ্যমে সবাইকে দিয়ে দেয়, কেউ কেউ কপি করে সবাইকে একই ম্যাসেজ দেয়।

মনে করুন, কেউ আপনাকে কপি-পেস্ট ম্যাসেজ দিলো, আরেকজন আপনাকে ফোন করে বললেও ‘ঈদ মোবারক’। কোনটা আপনার কাছে বেশি ভালো লাগবে? অবশ্যই, যে আপনাকে ফোন করে বলেছে। কারণ, আপনি তার মধ্যে আন্তরিকতা দেখতে পান।

কৃতজ্ঞতা আদায় হতে পারে ছোটো জিনিসের জন্য এবং বড়ো জিনিসের জন্য। যে আপনাকে ১ লক্ষ টাকা দিলো, তাকে আপনি ‘জাজাকাল্লাহু খাইরান’ বললেন, অথচ যে আপনাকে ১০ টাকা দিলো, তাকে বললেন না’ এমনটা হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“যে ছোটো কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে বড়ো কিছুর জন্যও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।” [আল-ফিরদাউদ লিল-দায়লামী: ৫৯৬২]
আপনি যদি ছোটো বিপর্যয়ে ধৈর্যধারণ করতে না পারেন, তাহলে বড়ো বিপর্যয় আসলে ভেঙ্গে পড়বেন। ঠিক তেমনি, কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা অভ্যাসের ব্যাপার, চর্চার ব্যাপার। হুট করে আপনি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন না। আস্তে আস্তে এটা শিখতে হবে, চর্চা করতে হবে।
কেউ যদি আপনাকে হাজার টাকার কোনো উপহার দেয়, আপনি তাকে শ’টাকার কোনো উপহার দিন। কেউ যদি আপনাকে দুটো বই উপহার দেয়, আপনি অন্তত তাকে একটি বই উপহার দিন। সবসময় অন্য দিবে, আপনি তার আশায় বসে থাকবেন, এমনটা যেন না হয়।
সময় পার হবার পরও আপনি অন্যের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। কেউ যদি ১০ বছর পূর্বে আপনার কোনো উপকার করে, আপনি ১০ বছর পরও তার সেই উপকারের কথা স্মরণ করুন। আপনি এটা ভাববেন না যে, তখন তো আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি, এখন কৃতজ্ঞতা আদায় করে কী হবে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁদের উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। আপনি-আমি কেনো করবো না? অথচ সাহাবীরা তো শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব করতেন। তারপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের অবদান স্মরণ করতেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন:
“নিজের সম্পদ এবং সাহচর্য দিয়ে যিনি আমার সবচেয়ে বেশি উপকারে এসেছেন তিনি হলেন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।” [সহীহ বুখারী: ৪৬৬]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে তিনি বলেন:
“আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিশেবে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। আবু বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের ছোটো দরজাগুলো সব বন্ধ করে দাও।” [সহীহ বুখারী: ৪৬৭]
কয়েক যুগ পর যখন শায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা হয়, তিনি তখন তাঁর দুধ-বোনের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। ছোটোবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লালন পালন করেন উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারাজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। তিনি তাঁকে ডাকতেন ‘মায়ের পর মা’ বলে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়ে তাঁর পাশে থাকেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেন, ইন্তেকালের পরও তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন।
কখনও ছাগল জবাই হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুঁজে খুঁজে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। [সহীহ বুখারী: ৬০০৪]

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা অটুট থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন তাঁর স্ত্রী এবং সাহাবীদের উপকারের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, তেমনি অমুসলিমদের কৃতজ্ঞতার কথাও স্মরণ করতেন। তেমন একজন অমুসলিম ছিলেন মুতঈম ইবনে আদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পর মুতঈম ইবনে আদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দেন। তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও বিভিন্ন সময় মুসলিমদের পাশে দাঁড়ান মানবিক কারণে। তাঁর কারণে নানান সময় মুসলিমরা উপকৃত হয়।

দুঃসময়ে উপকার করা মুতঈম ইবনে আদির প্রশংসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সামনে করেন। বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদেরকে তিনি মুক্ত করে দিতেন বিনা মুক্তিপণে, যদি মুতঈম তখন বেঁচে থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের সুদিনে ‘উপকারী বন্ধু’র প্রতিদান আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“যদি মুতঈম ইবনে আদি জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের জন্য সুপারিশ করতেন, তবে আমি তার সম্মানার্থে এদেরকে মুক্ত করে দিতাম।” [সহীহ বুখারী: ৩১৩৯, মুসনাদে আহমাদ: ২৭৫০৬]

আল্লাহ আমাদেরকে কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করুন। যে অল্পসংখ্যক লোক আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আমরা যেন সেই অল্পসংখ্যকদের দলভুক্ত হতে পারি এই কামনা করি।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মতো আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি-

“হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি ও আমার মা-বাবার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আপনার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক আমাকে দান করুন।” [সূরা আন-নামল ২৭: ১৯]

জবানের হেফাজত

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ,ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ, وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

“অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।” [সূরা মুমিনুন ২৩: ১-৩]

একজন মুমিন অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয় না। কোথাও অনর্থক কথা শুনলে সে সেখান থেকে চলে যায়। সেখানে বসে কান পেতে এসব শুনে না। আমারা শুরুতে বিনয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে সূরা ফুরকানের আয়াত উল্লেখ করেছিলাম।

আল্লাহ সূরা ফুরকানে বলেন:

“রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে- সালাম।” [সূরা ফুরকান ২৫: ৬৩]

আল্লাহ জানিয়ে দেন, যারা মুমিন, তারা মূর্খের কথায় কান দেয় না । মূর্খরা তাকে উত্তেজিত করতে চাইলেও সে মূর্খের সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হয় না। এর কয়েক আয়াত পর আল্লাহ বলেন:

“যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে, তখন তা পরিহার করে চলে।” [সূরা ফুরকান ২৫: ৭২]

মুমিন যখন দেখতে পায় রাস্তার পাশে মানুষজন অন্যের গীবত করছে, হোটেলে বসে আরেক বাড়ির দোষ-ত্রুটি তুলে ধরছে, তখন সে সেই মজলিশে বসে না; সে বরং সেখান থেকে উঠে যায়।

মুমিন কী শুনবে সে ব্যাপারে যমন সতর্ক থাকে, তেমনি কী বলবে সে ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করে। কেননা, তার প্রতিটি কথা ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করছেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“সম্মানিত লেখকবৃন্দ! তারা জানে যা তোমরা করো।” [সূরা আল-ইনফিতার ৮২: ১১-১২]

কথা বলার সময় আমরা কী বলছি সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। কথার জন্য আমরা নাজাত লাভ করতে পারি আবার কথার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করা হতে পারে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উকবা ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কী?”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি মুক্তির উপায় বলেন। সেগুলো হলো:

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ " أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ " .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

তুমি তোমার জবানের হেফাজত করো

তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয়

তোমার গুনাহের জন্য কান্না করো। [জামে আত-তিরমিজি: ২৪০৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তির তিনটি উপায়ের মধ্যে প্রথম উপায় বলেন- জবানের হেফাজত।

আরেকবার মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন একটি আমল আমাকে জানিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উপদেশ দেবার পর বললেন, “আমি যা বললাম, সেগুলোর সার-সংক্ষেপ বলবো?”

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “জ্বি, বলুন।”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন:

“এটা সংযত রাখো।”

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশ অবাক হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে কথাবার্তা বলি, এগুলোর সম্পর্কেও কি জবাবদিহি করতে হবে?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আরবের প্রচলিত প্রবাদ বললেন,

"হে মুয়াজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহ্বার উপার্জনের কারণেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [জামে আত-তিরমিজি: ২৬১৬]

মানুষ তার জবান দিয়ে মিথ্যা বলে, অন্যকে অপবাদ দেয়, গীবত করে, মানুষকে খোঁটা দেয়, গালাগালি করে। তার জিহ্বার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা তার জিহ্বার কারণে সে জান্নাত লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের মধ্যে সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সে আমার খুব নিকটে থাকবে। (অন্যদিকে) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে, তারা হলো:

বাচাল

ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং

অহংকারে মত্ত ব্যক্তি।" [জামে আত-তিরমিজি: ২০১৮]

যারা বাচাল, যারা সব ব্যাপারে কথা বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিন্দা করেন। তারা সব ইস্যুতে কথা বলে, লেখালেখি করে। যখন কেউ সব বিষয়ে কথা বলবে, সে অবশ্যই ভুল বলবে। তার কথার আর গুরুত্ব থাকবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"কোনো কিছুকে যদি জেলে নিতে হয়, তাহলে সেটা হলো জিহ্বা।" [আল মাজমু আল-কাবীর: ৮৭৪৫]

একজন মুমিনকে অবশ্যই তার জিহ্বা সংযত করতে হয়। সে যা বলে তাকে জেনেবুঝে বলতে হয়। তারপরও কিছু ব্যাপারে তাকে অতিরিক্ত সচেতনতা অবলম্বন করতে হয়। সেগুলো হলো:

১। মিথ্যা বলা:

মিথ্যা বলা মুমিনের গুণাবলী হতে পারে না। একজন মুমিন মিথ্যা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। মিথ্যা বলার পরিণাম নিয়ে পূর্বের একটি পর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

২। বিতর্কে লিপ্ত হওয়া:

এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। কেউ কিছু বললেই যেন আমরা তার ওপর ঝাপিয়ে না পড়ি, বিতর্ক শুরু না করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কোনো সম্প্রদায় হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে আবার পথ ভোলা হয়ে থাকলে তা শুধু তাদের বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হবার কারণেই।" [জামে আত-তিরমিজি: ৩২৫৩]

আপনি প্রয়োজন উপলব্ধি করে মানুষের সাথে বিতর্কে নামুন। আপনার আশেপাশে অনেকেই অনেক ভুল কথা বলবে, ভুল বক্তব্য দিবে। তাই বলে, সারাক্ষণ যদি আপনি বিতর্কে লিপ্ত হতেন, দেখা যাবে আপনি আর কোনো কাজ করতে পারবেন না। নামাজে গেলেও বিতর্কের কথা মনে পড়বে।

৩। মানুষকে উপহাস করা:

মানুষকে উপহাস করা, তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামশা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেক মানুষ দেখা যায়, তারা কারো সাথে কথা বলা শুরু করলে অন্যের দুর্বলতা নিয়ে কথা বলে, খোঁচা দেয়, খোঁটা দেয়। এগুলো মুমিনের বৈশিষ্ট্য না।

৪। অন্যকে খোঁটা দেয়:

অনেকেই দেখা যায় কারো উপকার করলে একসময় স্মরণ করিয়ে দেয়- 'মনে আছে, তুমি বিপদে পড়েছিলে, আমি টেনে তুলেছিলাম' কিংবা 'তুমি আমার মুখের উপর কথা বলো কেনো? আমি সারাজীবন তোমাকে দান করলাম, এখন আমার ওপর কথা বলবে?'

এগুলোর মাধ্যমে আপনি যে উপকার করেছেন, সেই উপকারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আপনার নেক আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা খোঁটা কিংবা কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের দান নষ্ট করো না।" [সূরা বাকারা ২: ২৬৪]

৫। গীবত ও নামিমাহ:

এই দুটো আলাদা বিষয় কিন্তু আমি এখানে একত্রে উল্লেখ করলাম। গীবত করা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে মনে করি, আমরা তো সত্য বলছি। আসলে এই সত্য বলে অন্যের নিন্দা করাটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো।" [সূরা হুজুরাত ৪৯:১২]

গীবত তাহলে কী?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতের এমন স্পষ্ট সংজ্ঞা দেবার পর সেটা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়।

একদিন তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো, গীবত কী?" সাহাবীরা জবাব দিলেন- "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞান।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতের সংজ্ঞা দিলেন:

"গীবত হলো- তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে।"

এমন স্পষ্ট সংজ্ঞা দেবার পরও সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যা বলছি, সত্যিই যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে এমন কিছু থাকে?" অর্থাৎ, যার সম্পর্কে এমন কথা বলা হচ্ছে, সত্যিই তারমধ্যে এসব আছে। তবুও কি সেটা গীবত হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সন্দেহ দূর করে বললেন:
“তুমি তার সম্পর্কে যা বলছো, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে তাহলে তো তুমি গীবতই করলে। আর যদি তারমধ্যে না থাকে, তাহলে তো তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে।” [সহীহ মুসলিম: ৬৪৮৭]
কারো গীবত শুনার পর আপনি যদি ঐ লোকটিকে গিয়ে বলেন, ‘শুনছো, অমুক তোমাকে কী বলেছে’ তাহলে সেটা হবে নামিমাহ।
৬। অশ্লীল কথা, গালাগালি:
একজন মুমিন কাউকে গালি দেয় না, কটু কথা বলে না। সে তার জবানের হেফাজত করে। কেউ তাকে গালি দিলেও সে প্রতিউত্তরে গালি দেয় না।
মুমিনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না
অভিসম্পাতকারী হতে পারে না
অশ্লীল কাজ করে না এবং
কটুভাষীও হয় না [জামে আত-তিরমিজি: ১৯৭৭]
আমরা আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের জীবনী পড়লে দেখতে পাই তারা কটুভাষী ছিলেন না, তারা অন্যকে গালাগালি করতেন না। জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতি তারা পার করেছেন। তবুও তারা চরিত্র বলে মহান ছিলেন।
আমাদের তরুণরা মনে করে গালাগালি করা স্মার্টনেস। এটা ভুল ধারণা। মুমিনের স্মার্টনেস হলো উত্তম কথা বলা, সুন্দর ভাষায় অন্যকে সম্বোধন করা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব সংক্ষেপে আমাদের জবানের হেফাজত নিয়ে একটি উপদেশ দেন। তিনি বলেন:
“যে নীরব থাকলো, সে নাজাত লাভ করলো।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৫০১]
মুমিন কখনো বাচাল হতে পারে না। সে নিরবতাকে বেছে নেয়। যখন কথা বলার প্রয়োজন হয়, তখন শুধু কথা বলে। নতুবা চুপ থাকে।
আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।” [সহীহ মুসলিম: ৮০]
মুমিনরা নিজেরা যেমন অনর্থক কথা বলে না, তেমনি অনর্থক কথা শুনেও না। এজন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- ‘যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে, তখন তা পরিহার করে চলে’।
এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন:
“আল্লাহ তা’আলার যিকির ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা, আল্লাহ তা’আলার যিকির ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ তা’আলা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৪১১]

অন্যের সম্মান রক্ষা করা

যখন একজন মুমিন শুনতে পায় তার আরেকজন ভাই-বোনকে অপমান করা হচ্ছে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা হচ্ছে, তখন সে বসে থাকতে পারে। সে চুপ থেকে শুনে যেতে পারে না। সে প্রতিবাদ করে। ঐ ভাই-বোনের সম্মান রক্ষার জন্য সে দাঁড়িয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

.

"যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিরোধ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডল জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিরোধ করবেন।" [জামে আত-তিরমিজি: ১৯৩১]

আপনি শুনতে পেলেন আপনার কয়েকজন বন্ধু আরেক বন্ধুর অনুপস্থিতে তাকে নিয়ে মজা করছে, তার সম্মানহানী করছে কিংবা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আরেকজনকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। সেই জায়গায় আপনি ঐ অনুপস্থিত ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। সবাই তাকে নিয়ে মজা করলেও আপনি সেই মজায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। একজন মুমিন হিশেবে আপনি এই কাজে বাধা দিবেন।

ঐ মজলিশে বা চ্যাট গ্রুপে যদি আপনি আরেকজনের সম্মান রক্ষা করেন, তাকে নিয়ে মজাকারীদের আলোচনা থামিয়ে দেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে আপনাকে প্রতিরোধ করবেন।

আপনি যদি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করেন, তাহলে দেখা যাবে আপনার অনুপস্থিতিতেও অন্য কেউ আপনার সম্মান রক্ষা করবে। আর আপনি যদিও সারাক্ষণ অন্যের সমালোচনা করতে থাকেন, অন্যকে নিয়ে গীবত করতে থাকেন, তাহলে কিভাবে আশা করেন আপনার অনুপস্থিতিতে আরেকজন আপনার সম্মান রক্ষা করবে? আপনার পক্ষে দাঁড়াবে?

ফিকহের কিতাবে কিছু মূলনীতি পাওয়া যায়। তারমধ্যে দুটো হলো:

আপনি যা করবেন, তাই পাবেন

পাপ-পুণ্য সেরকম হবে, আপনি যেরকম করবেন

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মোট ২২ টি কিতাব লিখেন। তারমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সহীহ বুখারী। সহীহ বুখারীর পর দ্বিতীয় জনপ্রিয় 'আল-আদাবুল মুফরাদ'। এই কিতাবের একটি অনুচ্ছেদ হলো- 'ভাইয়ের সম্মান রক্ষা'। সেই অনুচ্ছেদে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"কারো উপস্থিতিতে কোনো মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার অনুপস্থিতিতে মুমিনের সাহায্য করলে আল্লাহ তাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। (অন্যদিকে) কারো

উপস্থিতিতে কোনো মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হল এবং সে তার সাহায্য না করলে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এর মন্দ ফল ভোগ করাবেন।" [আল-আদাবুল মুফরাদ: ৭৩৯]

আপনি সবার সাথে বসে আছেন। লোকজন অন্যের গীবত করছে, আপনি গীবত করছেন না, শুধু শুনছেন। এক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন, "ভাই, এসব বাদ দিন। গীবত করে কী হবে? তারচেয়ে ভালো কথা বলি" তাহলে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। অন্যদিকে, আপনি যদি সবার মতো শুনে যান, প্রতিবাদ না করেন, তাহলে এরজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকে মন্দ ফল ভোগ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো খুতবা দেন। সেই খুতবায় হাজার-হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই খুতবায় বলেন:

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-সম্মান তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিনটি, তোমাদের এই শহর এবং এই মাস।" [সহীহ বুখারী: ১৭৩৯]

সেই ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দেন যে, মুসলিমের কাছে মুসলিমের রক্ত, সম্পদ যেমন সম্মানিত, মুসলিম চাইলেই যেমন আরেকজনকে হত্যা করতে পারে না, সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে না, তেমনি সে আরেকজন ইজ্জতের ওপর আঘাত করতে পারে না, সম্মানহানী করতে পারে না।

মুসলিম যখন দেখে আরেকজনের ইজ্জতহানী হচ্ছে, সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে কথা বলে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নামে যখন অপবাদ দেয়া হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর (যার নামে অপবাদ দেয়া হয়) অতীতের ভালো গুণের কথা উল্লেখ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন মদ্যপায়ী। তাঁর নাম ছিলো আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। প্রায়ই মদপানের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। একবার তাকে শাস্তি দেবার সময় আরেকজন সাহাবী বললেন, "হে আল্লাহ! তার উপর আপনার লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতোবার যে আনা হলো!"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীর এমন উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন:

"তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসে।" [সহীহ বুখারী: ৬৭৮০]

একজন মদ্যপায়ী সাহাবীর ভালো গুণের প্রশংসা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেন, তেমনি মদপানের জন্য তাকে শাস্তি দেন। অন্যরা তাকে লানত দিতে চাইলে তিনি সেই সাহাবীর পক্ষে কথা বলেন। তার সম্মান রক্ষা করেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হয়। তিনি এই ঘটনা প্রথমে জানতেন না। তাঁকে যারা অপবাদ দেয়, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে অপবাদ রটান।

একদিন মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, "মিসতাহর জন্য দুর্ভোগ!"

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বেশ অবাক হলেন। মা হয়ে উম্মু মিসতাহ তাঁর ছেলেকে বদ-দু'আ করছেন, অথচ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান রক্ষা করছেন। তিনি বলেন:

"তুমি খুব খারাপ কথা বলছো। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন এক ব্যক্তিকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছো!" [সহীহ বুখারী: ২৬৬১]

পুরো ঘটনা জানার পূর্বে তিনি মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান রক্ষা করেন। এটা ছিলো তাঁর স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া। তিনি একজন মুসলিমের সম্মানহানী হতে দিতেন না।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যারা অপবাদ দেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু।

অপবাদ আরোপের প্রায় বিশ পর একদিন হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে বেড়াতে যান। যে মানুষটি তাঁকে একসময় অপবাদ দিয়েছিলো, তাঁর সাথে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেমন আচরণ করবেন? তাঁকে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিবেন? তাঁকে সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিবেন?

না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেগুলো না করে বরং মেহমানকে সম্মানের সাথে গদি বিছিয়ে বসতে দেন। প্রায় বিশ বছর আগে যে ব্যক্তি একজন পুত-পবিত্র নারীর চরিত্র নিয়ে অপবাদ দেন, সেই নারী সেটা ভুলে (Forgive & Forget) গিয়ে তাঁকে বসার জন্য আসন পেতে দিচ্ছেন?

উম্মুল মুমিনীন আয়িশার রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাই ছিলেন আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বোনের এমন সহনশীলতা, উদারতা দেখে রাগ করলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তাঁকে গদির উপর বসতে দিলেন? আপনি কি ভুলে গেলেন তিনি আপনার চরিত্র নিয়ে অপবাদ দিয়েছিলেন?"

আপন ভাই মনে করিয়ে দিলেন। ভাই সত্য কথাই বলছে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি এবার আপন ভাইয়ের পক্ষালম্বন করে একজন মুসলিম ভাইকে তাঁর প্রায় বিশ বছর আগের কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন? তিনি ভাইকে বললেন-

"হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কাফিরদের কবিতার জবাব দিতেন। এতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরে শান্তি পেতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন, আমি আশা করি, আল্লাহ আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দিবেন না।" [তাহজীবু ইবনুল আসাকির: ৪/১২৯]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আপন ভাইয়ের বিপক্ষে গিয়ে আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত হেফাজত করেন; যিনি কিনা তাঁর ইজ্জত নিয়ে একসময় অপবাদ দেন! তিনি হাসসান বিন সাবিতের রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিবাচক গুণের প্রশংসা করেন।

তাবুক যুদ্ধে নারী ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম ব্যতীত সবার জন্য অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিলো। সেই যুদ্ধে আজ প্রস্তুতি নেবো, কাল প্রস্তুতি নেবো বলে কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারেননি। ফলে, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোঁজ নিলেন কে কে এসেছে আর কে কে আসেনি। তখন খোঁজ পড়লো কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর। একজন বলে উঠলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর ধন-সম্পদ ও অহংকার তাঁকে আসতে দেয়নি।"

কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যাপারে নিন্দা করলেন একজন সাহাবী। ঠিক সেই সময় আরেকজন সাহাবী তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন:

"তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি হিশেবেই জানি।" [সহীহ বুখারী: ৪৪১৮]

একজন মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই ভাইয়ের নিন্দা করতে দিচ্ছেন না, তাঁর ব্যাপারে সুধারণা রাখছেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল অজুহাত খুঁজছেন, নিশ্চয়ই কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিছু হয়েছে যার ফলে তিনি আসতে পারেননি। তিনি তো ভালো মানুষ, আমলদার ব্যক্তি। অহংকার করে পেছনে থাকা তাঁর কাজ না।

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়। যারা তাঁকে হত্যা করে, তাদের এক সমর্থক একবার হজ্জ করতে মক্কায় আসে। সে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করলো।

"বদর যুদ্ধে উসমান অনুপস্থিত থাকেন, সেটা কি আপনি জানেন?"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হ্যাঁ, জানি।"

"উহুদের দিন উসমান যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যান, এটা আপনি জানেন?"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হ্যাঁ, জানি।"

"বাইয়াতে রিদওয়ানে উসমান অনুপস্থিত ছিলেন, আপনি জানেন?"

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার বললেন, "হ্যাঁ, জানি।"

লোকটি যা চেয়েছিলো, তা পেয়ে গেলো। সে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে, এটার সত্যতা পেলো। আনন্দের আতিশায্যে বললো, "আল্লাহু আকবার!"

এবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "এবার আসো, তোমাকে সেই কারণগুলো বলি।"

বদর যুদ্ধে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুপস্থিতি থাকার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন তাঁর স্ত্রো ও রাসূলের মেয়ে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার দেখাশোনা করেন। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতো সওয়াব পাবেন, গণিমত লাভ করেন।

উহুদের দিন তিনি পালিয়ে যান, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি ঘোষণা করেন।

আর বাইয়াতুর রিদওয়ানের কারণই ছিলো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি মক্কায় গেলে গুজব রটলো, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ফলে, উসমান হত্যার বদলা নিতে সবাই বাইয়াত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বললেন, এটাই উসমানের হাত। তিনি রূপকার্থে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও সেই বাইয়াতে শরীক করেন। [সহীহ বুখারী: ৪০৬৬]

লোকটি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে যেসব অভিযোগ নিয়ে এসেছিলো, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু সেইসব অভিযোগের জবাব দেন এবং উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্মান রক্ষা করেন।

মানুষ সবসময় চায় বিতর্ক সৃষ্টি করতে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বিশুদ্ধ ব্যক্তি, যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পেতো, তাঁর ব্যাপারে পর্যন্ত মানুষ বিতর্ক করে, তাঁর সম্মানহানী করে। যখন আপনার-আমার বিরুদ্ধে কেউ কুৎসা রটাবে, তখন তাঁদের কথা ভাবতে পারেন। তারা আমাদের চেয়ে কতো উত্তম ছিলো। তবুও তাঁদেরকে নিয়ে মানুষজন দুর্নাম রটায়। কিন্তু, ইতিহাসের পাতায় তারা ঠিকই স্বসম্মানে আছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা অন্যের সম্মান রক্ষা করবো, ঠিক আছে। আমরা কি নিজের সম্মানও রক্ষা করবো? আমাদের ব্যাপারে যদি কেউ অভিযোগ করে, মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে, আমরা কি আত্মসম্মান রক্ষা করবো?

নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে আমরা এর উত্তর পাই। যখন তাঁর ব্যাপারে নারীরার অপবাদ দিয়েছিলো, তখন তিনি আত্মরক্ষা করেন, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। অন্যদিকে, তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চুরির অপবাদ দিলে তিনি তাদের অপবাদের জবাবে কিছু বলেননি।

তারমানে বুঝা গেলো, আমাদের মানহানী হলে আমরা যেমন মান রক্ষার জন্য প্রতিবাদ জানাতে পারি, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে সেদিকে কান না দিলেও হবে। কোন ক্ষেত্রে কথা বলবো এবং কোন ক্ষেত্রে কথা বলবো না এতা মাথায় রাখতে হবে। সারাক্ষণ যদি নিজেকে আত্মরক্ষা করতে যাই, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যাই, তাহলে আর কোনো কাজ করতে পারবো না।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে এক লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেপাশে তখন সাহাবীরাও ছিলেন। লোকটি একবার গালি দিলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু বললেন না। দ্বিতীয়বার গালি দিলো, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনও কিছু বললেন না।

লোকটি তৃতীয়বার গালি দিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিশোধ নিলেন। তিনিও গালি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি খুব রাগ করলেন। মজলিস থেকে চলে যেতে লাগলেন।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি আমাকে গালি দিলো, আপনি তখন বসা ছিলেন। কিন্তু, যখন আমি তার জবাব দিলাম, আপনি তখন রাগ করে চলে গেলেন!”

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটি বুঝলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাজ কেনো করলেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন:

"(তোমাকে যখন গালি দেয়া হচ্ছিলো, তখন) আসমান হতে একজন ফেরেশতা নেমে ছিলেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু, যখনই তুমি তার প্রতিশোধ নিলে, তখন শয়তান এখানে উপস্থিত হয়েছে। শয়তান এখানে উপস্থিত হওয়ায় আমি আর বসতে পারছি না।" [সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৯৬, মুসনাদে আহমাদ: ৯৪১১]

আমরা যদি দেখি আরেকজনকে নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে, গীবত করা হচ্ছে, আমরা তখন তার পক্ষে কথা বলবো। এটা মুমিন হিশেবে আমাদের দায়িত্ব। মুমিন পাপ কাজ দেখে বসে থাকতে পারে না, পাপের কথা শুনতে পারে না। আপনি যদি গান শোনা হারাম বুঝতে পারেন, তাহলে যেমন গানের আসরে বসেন না, তেমনি গীবতকে হারাম বুঝলে সেই আসরেও বসবেন না, সেখানকার আলোচকদের গীবত বন্ধের চেষ্টা করবেন।

মুমিন কোন কাজ করলে যথাযথ ভাবে করবে

একজন মুমিন গড়পড়তা কিছু পছন্দ করতে পারে না। তার আকাঙ্খা থাকতে হয় উঁচু। সে সাধারণ একজন হয়ে জীবন কাটাতে চায় না। সে চায় শ্রেষ্ঠ একজন হতে। দুনিয়াতেও শ্রেষ্ঠ, আখিরাতেও শ্রেষ্ঠ। একজন মুমিনের ভিশন হলো অনেক উপরে। সে সমাজের পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। সে নেতৃত্ব কামনা করে না, কিন্তু নেতার মতো জীবনযাপন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, সাহাবীদের জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই, তারা ছিলেন দুনিয়াতেও সফল, আখিরাতেও সফল। তারা দুনিয়ার মানুষদের নেতা, আখিরাতের মানুষদেরও নেতা।

কোনো সাহাবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, কোনো সাহাবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, কোনো সাহাবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি, কোনো সাহাবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকীহ, কোনো সাহাবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, কোনো সাহাবী ছিলেন সেরা ব্যবসায়ী। তারা একেকজন একেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে।" [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৩৩]

আল্লাহ আরো বলেন:

"তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে চলো।" [সূরা আয-যারিয়াত ৫১: ৫০]

আমরা অলস হয়ে বসে থাকার জন্য পৃথিবীতে আসিনি। কোনো কিছু চাইতে হলে ছোটোটা চাইবো না। আমরা বড়োটা চাইবো। এমনকি জান্নাতের বেলায়ও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আল-ফিরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। তোমরা যখন জান্নাত প্রাপ্তির দু'আ করবে, তখন আল-ফিরদাউসের জন্য দু'আ করবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ২২২৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শেখাচ্ছেন, আমরা যেনো সর্বোচ্চটা অর্জনের চেষ্টা করি, সর্বোচ্চটা অর্জনের দু'আ করি। মুসলিম হলো ভিশনারী জাতি। তারা ছোটোখাটো কোনো স্বপ্ন দেখবে না। আমরা ঘরের কোণে বসে থাকার স্বপ্ন দেখবো না। সাহাবীরাও দেখেননি। তারা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এক দেশ থেকে আরেক দেশ, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ছুটে চলেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। সেই মুসলিম জাতি কিভাবে ছোটোখাটো স্বপ্ন দেখে? কেনো তারা বড়ো স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়?

আমাদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবার জন্য। আমাদেরকে অনুসারী হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ প্রেরণ করেননি।

রাবীআহ ইবনে কা'ব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন মুক্ত দাস ছিলেন। একবার তাহাজ্জুদের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওজুর পানি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, "আমার কাছে কিছু চাও।"

রাবীআহ বললেন, "জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আর কিছু?"

তিনি জবাব দিলেন, তিনি আর কিছু না, শুধু এটাই চান। [সহীহ মুসলিম: ৯৮১]

রাবীআহ ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এতো কিছু থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সর্বোচ্চ জিনিস চান। সেটা হলো- রাসূলের সাথে জান্নাতে থাকা। এ থেকে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝা যায়।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারের একটি দল বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হাদীসটি শুনার সাথে সাথে উকাশাহ ইবনে মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন:

"হে আল্লাহ! তাঁকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" [সহীহ বুখারী: ৫৮১১]

উকাশা রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসটি শুনামাত্রই বলে উঠলেন তাঁর জন্য যেন দু'আ করা হয়।

জান্নাতের মোট আটটি দরজা। একেক দরজা দিয়ে একেক আমলকারী ঢুকবেন। যে আল্লাহর পথে জোড়ায় জোড়ায় ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে। যে সালাত আদায় করবে, তাঁকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে, তাঁকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোজা রেখেছে, তাঁকে রাইয়্যান নামের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সাদকাহ করেছে, তাঁকে সাদকাহর দরজা থেকে ডাকা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে এতটুকু বলার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। যে নামাজ পড়বে তাঁকে নামাজের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোজা রাখবে তাঁকে রোজার দরজা থেকে ডাকা হবে, যে জিহাদ করবে তাঁকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে; তাহলে এমন যদি হয়, একজন সবগুলোই করে, তাহলে কি তাঁকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাঁদের মধ্যে হবে।" [সহীহ বুখারী: ১৮৯৭]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জান্নাত সম্পর্কে এতোটাই আশাবাদী ছিলেন যে, তিনি কেবল এক দরজা থেকে ঢুকার আমন্ত্রণ পাবেন এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানতে চাইলনে, সবগুলো দরজা থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব কি-না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় আশা প্রকাশ করেন।

এই হাদীসটি শুনার পর আমরা হয়তো বলতাম, আমাদেরকে একটি দরজা থেকে যেন ডাকা হয়। কিন্তু, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা করছেন, এমন কি হতে পারে, যাকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? জান্নাত লাভের জন্য তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানে আল্লাহ আমাদেরকে একটি দু'আ শেখান। সেই দু'আয় আমরা বলি:

"হে আমাদের রব!...আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানান।" [সূরা ফুরকান ৭৪:২৫]

ভালো যা আছে, সবকিছু অর্জনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করবো, চেষ্টা করবো। আমরা সেরাদের সেরা হতে চাই। কোনোরকম বেঁচে থাকতে চাই না। আমরা সমাজে প্রভাবশালী হতে চাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো, আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না।" [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৯]

অলসতা হলো মুনাফিকের লক্ষণ। কর্মক্ষমতা হলো মুমিনের গুণ।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের নামাজ সম্পর্কে বলেন:

"আর তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়।" [সূরা আন-নিসা ৪: ১৪২]

মুনাফিকরা নামাজে দাঁড়ানোর সময় এনার্জি পায় না, অলস হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অলসতা, অক্ষমতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেন:

"হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।" [সহীহ বুখারী: ২৮২৩]

নেতা ও কর্মীর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তারমধ্যে একটি হলো- নেতার শুধুমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষাই থাকে না, সেটা কিভাবে লাভ করতে হয় তিনি প্রচেষ্টা চালান এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করেন। একজন মুমিন যেমন পরিকল্পনা করে, তেমনি পরিকল্পনাকে কাজেও পরিণত করে। মুমিন শুধুমাত্র দুনিয়া নিয়ে পরিকল্পনা করে না, সে আখিরাত নিয়েও পরিকল্পনা করে।

আপনি কোনো কাজ যখন করবেন, সেটা ভালোভাবে করবেন। আল্লাহ তাঁদেরকে পছন্দ করেন, যারা কোনো কিছু যথাযথভাবে করে। পরীক্ষায় সি- পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিবেন না। পরীক্ষা দিবেন এ+ পাবার জন্য। আপনি যে কাজ করবেন, সেটা সর্বোচ্চটুকু দিয়ে করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আল্লাহ সেই কাজটি পছন্দ করেন, যা যথাযথভাবে করা হয়।" [তাবরানী: ৯০১]

আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন, তখন নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে যুদ্ধ করুন। আপনি যখন পশু জবাই করবেন, তখন সেটা ভালোভাবে জবাই করুন। জবাই করার অস্ত্র ভালোভাবে ধারালো হতে হবে। মুরগি বা গরুটি যেন কম কষ্ট পায়, এদিকটাও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান।

চিন্তা করুন, একটি মুরগি জবাই করতে হলে যদি যথাযথভাবে জবাই করতে হয়, তাহলে আমরা যে চাকরি করি, যে ব্যবসা করি, সেটা কিভাবে করা উচিত? মুমিনরা কোনোরকমে কোনো কাজ করতে পারে না। মুমিন একটি কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"যদি কেয়ামত সংঘটিত হয়, আর এটা অবশ্যম্ভাবী, তখন যদি হাতে একটি চারাগাছ থাকে, সেটা রোপণ করো।" [মুসনাদে আহমাদ: ১২৪৯১]

অর্থাৎ, আপনার হাতে একটি চারাগাছ, কিন্তু মনে হচ্ছে কেয়ামত সংঘটিত হচ্ছে, আপনি গাছটি রেখে দৌড়ে পালাবেন? না। কিয়ামত সংঘটিত হলে আপনি দৌড়ে কিছুই করতে পারবেন না। ইসলাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে আশার সঞ্চার করে কাজ করে যেতে বলছে। গাছ লাগানো, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ইসলাম এতোটা গুরুত্ব দিয়েছে যে, ইসলাম উদাহরণস্বরূপ বুঝাচ্ছে- কিয়ামতের মতো মহা বিপর্যয়ের মুহূর্তেও আপনি হাল ছাড়বেন না, মানুষের তরে কাজ করে যাবেন।

ন্যায়বিচার : বর্তমান সময়ের হারিয়ে যাওয়া গুণ

আল্লাহ যে কারণে কুরআন নাযিল করেন, তার অন্যতম কারণ হলো ন্যায়বিচারের গুণটি প্রতিষ্ঠা করা। মুমিনের একটি গুণ হলো, সে ন্যায়বিচারী। সে নিজে অন্যায় করে না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না।

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত প্রতিটি জুমুআর খুতবায় খতীব তেলাওয়াত করেন إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। [সূরা আন-নাহল ১৬: ৯০]

খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহর সময় থেকে প্রতিটি খুতবায় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশের খতীব জুমুআর খুতবায় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেন'।

পবিত্র কুরআনে ন্যায়পরায়ণতা বুঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা হলো 'কিসত্বয়াত'। এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'ইউসতিস'। ল্যাটিন ইউসতিস থেকে প্রাচীন আরবরা ন্যায়পরায়ণতা বুঝাতে 'কিসত্বয়াত' শব্দটি ব্যবহার করে। ল্যাটিন 'ইউসতিস' থেকে ইংরেজি 'Justice'।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা মা-বাবার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও, তবে (জেনে রাখো) তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।" [সূরা আন-নিসা ৪: ১৩৫]

আপনাকে যদি এমন কিছু বলতে হয়, এমন কোনো বিচার করতে হয়, যা আপনার মা-বাবার বিরুদ্ধে যায়, যা আপনার ভাই-বোনের বিরুদ্ধে যায়, আপনি তখন ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন। এই কাজটি সবচেয়ে কঠিন। নিজের পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের কোনো ঝামেলা হলে আমরা বুঝে, না বুঝে পরিবারের পক্ষে থাকে। কে ঠিক আর কে ভুল সেটা ভুলে যাই। কিন্তু, ন্যায়ের বেলায় নিজের মা-বাবার চেয়ে আল্লাহর হক বেশি। এক্ষেত্রে মা-বাবার কথা না ভেবে ন্যায়ের কথা ভাবতে হবে।

আপনি যখন বিচার করবেন, ঘটনা দেখে বিচার করবেন, ব্যক্তি দেখে নয়। কাজটি 'কী' করা হয়েছে সেটা দেখে বিচার করবেন, 'কে' করেছে সেটা দেখে নয়। যদি এমন হয় যে, কাজটি অন্য কেউ করলে আপনি একধরনের শাস্তি দেন অথচ নিজের কেউ করলে আরেক ধরনের শাস্তি, তাহলে তো আপনি ন্যায়বিচার করলেন না। স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিলেন। বিচারের বেলায় স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেয়া যাবে না।

পাশ্চাত্যে ন্যায়বিচারকে প্রতীকী অর্থে বুঝাতে একজন চোখ বাঁধা নারী দাঁড়িপাল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। রূপক অর্থে বুঝানো হয়- চোখ বেঁধে সে দেখতে পায় না ঘটনাটি কে করেছে, কার সাথে ঘটেছে। বরং সে দেখে কী ঘটেছে। ন্যায়পরায়ণতা মানে- আইনের চোখে সবাই সমান; আপন-পর বলতে কিছু নেই।

আপনার মা-বাবা যদি কোনো অন্যায় করেন, আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময় প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন। এটা আল্লাহর আদেশ। এক্ষেত্রে আপনার জন্মদাতা-জন্মদাত্রী মা-বাবার চেয়ে আল্লাহর আদেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরো বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিশেবে সদা অবিচল থেকো। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে না। তোমরা ন্যায়বিচার করো, (কেননা) তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো।" [সূরা আল-মায়িদাহ ৫: ৮]

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ বলেন নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষ কিছু করলে ন্যায়বিচার করতে, এই আয়াতে আল্লাহ বলেন আপনার কোনো শত্রু কিছু করলে তার প্রতিও ন্যায়বিচার করতে। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে দুটো কাজই সবচেয়ে কঠিন।

নিজের আপনজনের বিপক্ষে ন্যায়বিচার করা

নিজের শত্রুর পক্ষে ন্যায়বিচার করা।

আপনার কোনো শত্রু যদি আপনার কাছে ন্যায়বিচারের জন্য আসে, সে যে আপনার শত্রু এটা ভুলে যেতে হবে। বিচারের সময় তার কাজের ওপর বিচার করতে হবে। সে আপনার বন্ধু নাকি শত্রু সেটা বিবেচ্য নয়।

মুমিনের আখলাকের অন্যতম উপাদান হলো ন্যায়পরায়ণতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ ন্যায়বিচারের আদেশ দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিতে বলেন:

“তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।” [সূরা আশ-শুরা ৪২:১৫]

আল্লাহ পৃথিবীতে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন ন্যায়বিচারের জন্য। মানুষের মধ্যে যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“নিশ্চয় আমি রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড নাযিল করেছি; যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।” [সূরা হাদীদ ৫৭:২৫]

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে। ‘কোনো কিছু চিনতে হলে তার বিপরীতটা দেখতে হবে’।

ন্যায়বিচারের বিপরীত হলো যুলুম। ন্যায়বিচারের গুরুত্ব কতো বেশি, সেটা যুলুম দেখে বুঝা যায়। যে একবার প্রতারণার শিকার হয়েছে, যুলুমের শিকার হয়েছে, সে জানে ন্যায়বিচারের মূল্য কী।

যুলুম আর শিরক প্রায় সমার্থক। পবিত্র কুরআনে লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, শিরক হলো সবচেয়ে বড়ো যুলুম। আল্লাহ যালিমদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। যালিমদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলুম করেছে।” [সূরা ইউনুস ১০: ১৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .

“যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে।” [সহীহ মুসলিম: ৬৪৭১]

আপনি যদি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় কারো ওপর যুলুম করেন, সেটার ফল দুনিয়াতে না পেলেও আখিরাতে পাবেন। দুনিয়াতে কারো ওপর যুলুম করলে বেঁচে থাকাবস্থায় তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিন, তার অধিকার ফিরিয়ে দিন। যদি তা না করেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আপনার নেক আমল তাকে দেয়া লাগবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানী বা অন্য কোনো বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার কোনো দিনার/দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেয়া হবে। আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।” [সহীহ বুখারী: ২৪৪৯]
দুনিয়াতে থাকাবস্থায় যুলুমের শোধ করতে না পারলে যার ওপর যুলুম করেছেন, সে আপনার নেক আমল নিয়ে যাবে। আপনার যদি নেক আমল না থাকে, তার গুনাহের ভার আপনার ওপর দেয়া হবে। আপনি যদি কারো হক মেরে খান, কাউকে টাকা না দিয়ে কোনো কিছু জোর করে ছিনিয়ে নেন, তাহলে তার কাছে মাফ চান, তার টাকাগুলো ফেরত দেন। কিয়ামতের দিন এই টাকার বদলে আপনার নেক আমল নিয়ে যাবে।
আমাদের আলেমগণ বলেন, যুলুম তিন প্রকার। সেগুলো হলো:
আল্লাহর সাথে যুলুম, যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। সেটা হলো শিরক।
বান্দার সাথে যুলুম, কিয়ামতের দিন যার হিশাব দিয়ে পার পেতে হবে। আপনি কারো সাথে কোনো অন্যায় করলে দুনিয়াতে পার পেলেও কিয়ামতের দিন পার পাবেন না।
নিজের সাথে যুলুম। আপনি যদি গোপন পাপ করেন, আল্লাহ চাইলে সেটা ক্ষমা করে দিবেন।
আপনি অন্যের সাথে যুলুম করলে আল্লাহ সেটা ক্ষমা করবেন না, যতোক্ষণ না যার সাথে যুলুম করেছেন সে ক্ষমা করে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“মাযলুমদের বদদু’আকে ভয় করবে। কেননা, মাযলুমের বদদু’আ এবং আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না।” [সহীহ বুখারী: ৪৩৪৭]
আপনি যার ওপর যুলুম করবেন, সে যদি আপনার বিরুদ্ধে দু’আ করে, আল্লাহ সেই দু’আ সরাসরি কবুল করে নেন। আল্লাহ যালিমদেরকে ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। যালিমরাও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের আওতায়, তারা যতো ক্ষমতাবান হোক না কেনো।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“আল্লাহ যালিমদের ছাড় দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।” [সহীহ বুখারী: ৪৬৮৬]
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও তা কাফির রাষ্ট্র হোক না কেনো। কিন্তু, আল্লাহ যালিম রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন না, যদিও তা মুসলিম রাষ্ট্র হোক না কেনো।” [ইবনে তাইমিয়া, মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ২৮/৬৩]
এই কথার প্রমাণ আমরা বর্তমান সময়েও দেখতে পাই। আমরা দেখি, অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রকে আল্লাহ সাহায্য করছেন, কিন্তু মুসলিমপ্রধান দেশগুলো যালিম শাসকের দ্বারা শাসিত হবার কারণে আল্লাহর সাহায্য পাচ্ছে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথার স্বপক্ষে তাবরানীর একটি হাদীস পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যারা ন্যায়পরায়ণ, তাদের ঈমান না থাকলেও আল্লাহ তাদেরকে কিছুটা সুরক্ষা দেন। অন্যদিকে, যাদের ঈমান আছে, কিন্তু তারা অত্যাচারী, তাদেরকে আল্লাহ সুরক্ষা করেন না।”

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি কেইস নিয়ে আসা হয়। মাখযূম গোত্রের এক নারী চুরি করে। সে ছিলো আবু লাহাবের গোত্রের, সম্ভ্রান্ত গোত্রের। সবাই ভেবেছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলের কাছে সুপারিশ করার জন্য পাঠানো হয় তাঁর প্রিয় সাহাবী উসামা ইবনে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে।

একজন সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে সাহাবীর সুপারিশ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব রাগ করেন। তিনি বলেন:

“তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এই কাজের জন্য ধ্বংস করা হয়েছে। যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করতো, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিতো। অন্যদিকে, যখন কোনো অসহায়-গরীব, সাধারণ লোক চুরি করতো, তখন তার ওপর শাস্তি কায়েম করতো। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কন্যা ফাতিমা চুরি করতো, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।” [সহীহ বুখারী: ৩৪৭৫]

ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা অনেক সময় অন্যের দিকে তাকাই। আমরা শুধু বলি, অমুক নেতা ন্যায়বিচার করেন না, অমুক শাসক ন্যায়বিচার করেন না। হ্যাঁ, ঐ শাসক ন্যায়বিচার না করলে আল্লাহ তার বিচার করবেন। আমরা নিজেরা ন্যায়বিচার করি কিনা সেটা হলো প্রশ্ন। আমাদের সন্তান, স্ত্রী, আত্মীয়ের সাথে ন্যায়বিচার করি কিনা সেই বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“তোমাদের সন্তানদের সাথে ন্যায়বিচার করবে, তোমাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করবে।” [সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৪৪]

আপনি আপনার সন্তানদের সাথে যেন ন্যায়বিচার করেন, সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন।

ন্যায়বিচারের একটি স্বর্ণালী ঘটনা ইতিহাস বইয়ে লিপিবদ্ধ।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন খলিফা। তাঁর একটি ঢাল হারিয়ে যায়। ঢালটি খুঁজে পাওয়া যায় এক ইহুদির কাছে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইহুদিকে ধরে নিয়ে যান বিচারক কাজি শুরায়হ ইবনে আল-হারিস রাহিমাহুল্লাহর কাছে।

ঢালটি যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর, সেটার সাক্ষী ছিলেন দুজন। একজন তাঁর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরেকজন তাঁর দাস কানবার।

বিচারক কানবারের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু বাবার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না। কারণ, স্বজনপ্রীতির জায়গা থেকে এটা করা হয়নি।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিচারের রায়ে হেরে যান।

ইহুদি দেখলো একজন খলিফা হওয়া সত্ত্বেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যাপ্ত সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপন না করায় রায় তাঁর বিপক্ষে গেলো। তিনি বুঝে গেলেন ইসলামের ন্যায়বিচারের গুরুত্ব। বিচারকের রায়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঢালটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিরিয়ে দেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশি হয়ে নও-মুসলিমকে ঢালটি উপহার দেন। [আব্দুল মা'বুদ, তাবেয়ীদের জীবনকথা: ১/১৮৮-১৮৯]

খুলাফায়ে রাশেদীন এতো সম্মানিত, কারণ তারা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তাদের যুগটি সর্বোত্তম, কারণ তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা যেন আমাদের জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। মুমিন হিশেবে এটা আমাদের কর্তব্য।

ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগানো

মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগানো। পরিবার ও সমাজের জন্য এই গুণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে মাঝেমধ্যে টানাপোড়ন দেখা দেয়, সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ভাই ভাইয়ের সাথে কথা বলে না, বোন বোনের সাথে কথা বলে না, এক আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের সাথে কথা বলে না।

ইসলামি শরীয়ত আমাদেরকে উৎসাহ দেয়, এমনটা হলে আমরা যেন এগিয়ে যাই, সম্পর্ক জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা নিই। ইসলাম আমাদেরকে এসব ক্ষেত্রে বসে থাকতে বলে না। আমরা যেন উদ্যোগী হই, সে ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে উৎসাহ দেয়।

আপনি লোকজনকে গিয়ে বলছেন, 'আমার চাচা আর চাচাতো ভাই কথা বলে না', 'আমার ফুফাতো ভাই আর আমার ভাইয়ের মধ্যে সমস্যা, তারা কথা বলে না'। এই বলার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আপনার দায়িত্ব হলো, কী করলে তারা কথা বলবে সেটা নিশ্চিত করা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"যদি মুমিনদের দুটো দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" [সূরা হুজুরাত ৪৯: ৯]

এখানে 'দুই দল' হতে পারে দুটো গোত্র, দুটো দেশ, দুটো জাতি, দুটো পরিবার, এমনকি দুজন ব্যক্তি। যখনই তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে, আপনার কাজ না দর্শক হয়ে সেটা উপভোগ করা। আপনার দায়িত্ব হলো তাদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেয়া।

গোপনে বৈঠক করা সাধারণত খারাপ। তবে, তিনটি ক্ষেত্রে গোপন বৈঠক প্রশংসনীয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে), যে নির্দেশ দেয় সদকার, ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে, তবে অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবো।" [সূরা আন-নিসা ৪:১১৪]

বেশিরভাগ গোপন বৈঠকের খারাপ উদ্দেশ্যে থাকে। তবে, আল্লাহ তিন ধরনের গোপন বৈঠকের প্রশংসা করেছেন; যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সম্পর্ক জোড়া লাগানো।

আপনার দুজন কাজিন পরস্পর কথা বলে না। আপনি বাকি কাজিনদের সাথে মিলে গোপনে বৈঠক করলেন একটি পিকনিকে যাবেন সবাইকে নিয়ে। পিকনিকে যাবার উদ্দেশ্য হলো ঐ দুই কাজিনের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করা। এসব ক্ষেত্রে গোপন বৈঠক প্রশংসনীয়।

মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোড়া লাগানোটাও একটি ইবাদাত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা নামাজ, রোজা, সাদকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি কি তোমাদেরকে নামাজ, রোজা ও সাদকার চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে বলবো না?"

সাহাবীরা জানতে চাইলেন, "হ্যাঁ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। কেননা, পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হবার অর্থ হলো দ্বীন বিনাশ হওয়া।" [জামে আত-তিরমিজি: ২৫০৯]

এসব আমল নিয়ে যেভাবে কথা বলা দরকার, আমরা সেভাবে বলি না। ফলে, আমরা মনে করি, ইসলাম আমাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা করতে বলে, শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ভাবতে বলে। এটা ঠিক না। আপনি অন্যকে নিয়েও ভাববেন, সেটা কল্যাণের উদ্দেশ্যে। অন্যরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে আপনি মিটিয়ে দিবেন। কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলে আপনি সেটা জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানান, সেই কাজটি নামাজ-রোজার চেয়েও উত্তম।

আমরা যদি আসলেই সবাইকে ভালোবাসি, তাহলে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ আমরা পছন্দ করবো না। আমরা এগিয়ে যাবো সম্পর্ক জোড়া লাগাতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে খুতবা দিচ্ছেন। তাঁর আদরের নাতি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মসজিদে দেখে তিনি তাঁকে কোলে নেন, কোলে নিয়ে খুতবা দেন। তখন তিনি বলেন:

"নিশ্চয়ই আমার এই নাতি নেতা হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের দুটো বড়ো দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন।" [সহীহ বুখারী: ২৭০৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দেন যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতা হবেন। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, যখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত দাবি করেন, ঐদিকে ছিলেন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যকার আবশ্যিক সংঘাত এড়ানো যায়। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এজন্যই নেতা যে, তিনি উম্মাহর প্রয়োজনে তাঁর যৌক্তিক দাবি প্রত্যাহার করেন, মুসলিমদের মধ্যকার সন্ধি স্থাপনে, সম্পর্ক রক্ষার জন্য নিজের দাবি থেকে সরে আসেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতে দেখা যায় তিনি অসংখ্যবার মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক জোড়া লাগান।

একবার তাঁর মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে গিয়ে দেখেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মেয়ের ওপর রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। তিনি মসজিদে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা মনে করেননি যে, 'এসব তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, তোমরাই ঠিক করো'। তিনি বরং মসজিদে যান, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য তাঁকে সুন্দর একটি নামে ডাকেন 'হে আবু তুরাব'। [সহীহ বুখারী: ৪৪১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান মদীনার অলিতে গলিতে এক যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। যেই তাঁকে এভাবে দেখছে তার মায়া লাগছে। মদীনার সমাজ, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন, সেই সমাজের একজন লোক একজন মেয়ের জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছেন!

তাঁর নাম মুগীস। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী এবং একজন দাস। বারীরা নামের এক মেয়ের পিছু পিছু তিনি ঘুরছেন। বারীরা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তারা দুজনই দাস-দাসী ছিলেন। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার পর তাদের বিয়েটি বহাল রাখবেন কিনা সেটা তাদের এখতিয়ার। মুগীস বিয়ে বহাল রাখতে চাইলেন, কিন্তু বারীরা চাইলেন না।

বারীরা মুগীসকে তালাক দিয়ে সে চলে গেলেন। কিন্তু, বারীরার চলে যাওয়া মুগীস মেনে নিতে পারেননি। বাচ্চা ছেলেদের মতো বারীরা পিছু পিছু ঘুরছেন। কান্না করতে করতে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেছে।

মুগীসকে এই অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও মায়া হলো। মুগীসের আবেগটি তিনি অনুভব করলেন। তাঁর সাথে থাকা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হওনা?"

মুগীসের কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ নিয়ে বারীরার কাছে গেলেন। বারীরাকে গিয়ে বললেন, "তুমি যদি তাঁর কাছে আবার ফিরে যেতে!"

বারীরা ছিলেন বেশ বুদ্ধিমতী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথাটি পরিস্কার করেন। "না, আমি কেবল সুপারিশ করছি।"

বারীরা যখন বুঝলেন এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ না, তিনি চাইলে নিজের মতের ওপর চলতে পারেন তখন বললেন, "আমি তাঁকে (মুগীসকে) চাই না।" [সহীহ বুখারী: ৫২৮৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক জায়গা থেকে তাঁদেরকে মিলিয়ে দিতে আসলেন, মুগীসের পক্ষ হয়ে বারীরার কাছে সুপারিশ করলেন। কিন্তু, বারীরা সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর জোরাজুরি করেননি।

সাধারণত মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ। কিন্তু, যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাকে ইসলাম সমর্থন করে, তারমধ্যে একটি হলো সম্পর্ক জোড়া লাগানো। দুজনের মধ্যে যদি সম্পর্কের টানাপোড়ন দেখা দেয়, কথা বলা বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাদেরকে এক করে দিতে আপনি মিথ্যা বলতে পারেন।

যেমন: দুজন মানুষের মধ্যে যদি মন কষাকষি হয়, তাদেরকে একত্র করতে প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে পারেন। যেমন: একজনকে বলতে পারেন, অমুক তো তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে অনুতপ্ত, সে আমাকে বললো তোমার সাথে কথা বলতে চায়। আবার, অন্যজনকে গিয়ে বলুন, অমুক সেদিন যেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, এটার জন্য পরে কষ্ট পেয়েছে। সে চাচ্ছে তোমার সাথে কথা বলতে। আসো, তার সাথে গিয়ে কথা বলি।

এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকের মধ্যে আপোষ সমাধা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই মিথ্যা বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোখলখোরী করে।" [সহীহ মুসলিম: ৬৫২৭]

মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোড়া লাগাতে মিথ্যা বলা পর্যন্ত অনুমোদিত। এ থেকে বুঝা যায় সম্পর্ক জোড়া লাগানো ইসলামে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য একজন আলেম বলেন:

"সত্য বলে সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লাহ অপছন্দ করেন। কিন্তু, মিথ্যা বলে সম্পর্ক জোড়া লাগানো আল্লাহ পছন্দ করেন।"

সমাজে যদি এই আখলাক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অসংখ্য সম্পর্ক জোড়া লেগে যাবে। মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য হলে সেটা মিটে যাবে। কারণ, অন্যরা উদ্যোগ নিবে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও।" [সূরা হুজুরাত ৪৯: ১০]

যে মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো ক্ষমাশীলতা। মুমিন আল্লাহর ক্ষমা পেতে চায়, সেজন্য সে অন্যকেও ক্ষমা করে। সে যেমন চায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তেমনি সে অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৩৪]

এই আয়াতের পরের আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দেন মুত্তাকি কারা। তিনি বলেন:

যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে

রাগ সংবরণ করে ও

মানুষকে ক্ষমা করে [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৩৫]
যারা জান্নাত লাভ করবে, তাদের অন্যতম গুণাবলী হলো, তারা মানুষকে ক্ষমা করে। কেউ একজন এমন একটি কাজ করলো, যেটাকে আপাতত মনে হচ্ছে ক্ষমার অযোগ্য, তখন সে তাকে ক্ষমা করে দেয়। এই ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

মানুষকে তখন ক্ষমা করা হয়, যখন সে আপনার সাথে কোনো অন্যায় করে। অন্যায় না করলে তো ক্ষমার প্রশ্ন আসে না। কেউ এমন কিছু করেছে, যা আপনি অপছন্দ করেন বা আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তখন তার ওপর রাগ হয়। তাকে যদি ক্ষমা করতে হয়, সেই মুহূর্তে নিজের রাগ সংবরণ করে ক্ষমা করতে হয়।

আপনার অধিকার ছিলো তাকে শাস্তি দেবার। শরীয়তের আলোকে বা সামাজিক আইনের আলোকে। কিন্তু, আপনি তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন। এটাই হলো ক্ষমাশীলতা।

মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"যখন রাগান্বিত হয়, তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।" [সূরা আশ-শুআরা ৪২: ৩৭]

সাধারণত মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে অন্যকে শাস্তি দেয়। রাগের সময় ক্ষমার প্রশ্নই আসে না! কিন্তু, আল্লাহ মুমিনের গুণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তারা রাগান্বিত অবস্থায় ক্ষমা করে।

কেউ যদি আপনাকে রাগায়, আপনার সাথে মন্দ আচরণ করে, তাহলে প্রতিশোধ নেবার অধিকার আপনার আছে। আপনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। যতোটুকু করেছে, ততোটুকুর শাস্তি।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।" [সূরা আশ-শুআরা ৪২: ৪০]

আল্লাহ এখানে দুটো নিয়মের কথা বলেন।

কেউ আপনার সাথে মন্দ আচরণ করলে আপনি অনুরূপ তার সাথে মন্দ আচরণ করতে পারেন। কেউ আপনাকে থাপ্পড় মারলে আপনি অনুরূপ তাকে থাপ্পড় মারতে পারেন। কিন্তু, অনুরূপ সেই কাজকেও আল্লাহ 'মন্দ কাজ' বলেছেন। একজন খারাপ ব্যক্তি আপনার সাথে যেমন আচরণ করলো, আপনি ভালো হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে অনুরূপ খারাপ আচরণ করলেন।

অথবা আপনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আপনার অধিকার ছিলো তাকেও অনুরূপ বলার, তার সাথে অনুরূপ আচরণ করার। কিন্তু, আপনি মন্দের দিকে না এগিয়ে উত্তমের দিকে এগিয়ে যান। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে, আল্লাহ বলছেন, এজন্য আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। কী পুরস্কার দেয়া হবে সেটা আল্লাহ বলেননি। তারমানে, আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

সর্বোত্তম ক্ষমা হলো নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে ক্ষমা করে দেয়। প্রতিদিন এমন অসংখ্য কারণে আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে রাগারাগি করে, এক আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের সাথে কথা বলা

বন্ধ করে দেয়। এসব ক্ষেত্রে যদি একপক্ষ ক্ষমাশীল আচরণ করতে পারে, তাহলে সম্পর্ক জোড়া লেগে যেতো।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। আর যদি তোমরা মার্জনা করো, এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।" [সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: ১৪]

অর্থাৎ, পরিবারের কেউ আল্লাহর পথে চলতে, দ্বীন মানতে বিরত রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি বিষয়ের কথা বলেন, যেগুলো সম্পর্কে আমরা একধরনের ধারণা করি, বাস্তবে সেগুলো অন্যরকম। আমরা মনে করলে দান করলে সম্পদ কমে, ক্ষমা করলে মর্যাদা কমে, বিনয়ী হলে সম্মান কমে। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ" . ُ

এসব ধারণা ঠিক নয়। তিনি বলেন:

দান করলে সম্পদ কমে না

যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। [সহীহ মুসলিম: ৬৪৮৬]

অর্থাৎ, যে ক্ষমা করে, সে দুর্বল নয়। সে বরং তারচেয়ে শক্তিশালী, যে প্রতিশোধ নেয়। প্রতিশোধ নেয়া কোনো গুণ না, কিন্তু অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া একটি গুণ।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি গুণ বর্ণনা করেন:

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে, আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।" [সহীহ বুখারী: ৩৫৬০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনী পড়লে ক্ষমাশীলতার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বন্ধু-শত্রু সবাইকে ক্ষমা করেন। তায়েফবাসী, যারা তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিলো, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন। মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাবাসীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

তবে, একটি জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন। ক্ষমা করে দেয়া মানে এই না যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া। আপনি যদি কাউকে ক্ষমা করেন, তারমানে এই না যে আপনি তার অন্যায়কে অন্যায় মনে করেননি। 'সে আমার সাথে এমন করলো, তাকে কিভাবে ক্ষমা করে দেই?'

অন্যায় অন্যায়ই থেকে যাবে। আপনি কাউকে ক্ষমা করার মানে হলো আপনি তার মতো আচরণ করলেন না, তারচেয়ে উত্তম আচরণ করলেন।

আপনি ক্ষমা করে দিলে যেমন উত্তম আচরণ করলেন, তেমনি মানসিক প্রশান্তি পাবেন। সাইকোলজিস্টরা বলেন, মানসিক প্রশান্তির অন্যতম উপায় হলো ক্ষমাশীলতা।

ইসলামি শরীয়ত ক্ষমাশীলতাকে উৎসাহিত করে। তারমানে এই না যে, ক্ষমা করা ওয়াজিব বা করতেই হবে এরকম আবশ্যক। মাঝেমধ্যে ক্ষমা করতে না পারাটাই বরং উত্তম। যেমন: কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাকে বারবার বলতে পারবেন না 'ক্ষমা করে দিলাম'। ক্ষমাশীলতারও একটি সীমানা আছে। সেই সীমানা বুঝে ক্ষমা করতে হবে। যদি এমন হয় কাউকে ক্ষমা করার ফলে সে পাপের সুযোগ পাচ্ছে, সরলতা মনে করছে, তখন তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

এসবক্ষেত্রে পাঁচটি অপশন আছে। সেগুলো হলো:

১। কেউ আপনার ক্ষতি করলো, আপনি তার কয়েক গুণ ক্ষতি করলেন। কেউ আপনাকে একটি কটু কথা বললো, আপনি তাকে দশটি কটু কথা বললেন। কেউ অসাবধানতাবশত আপনাকে ধাক্কা দিলো, আপনি তার হাত-পা ভেঙ্গে ফেললেন। এই ধরণের কাজ হলো হারাম।

২। কেউ আপনার যেমন ক্ষতি করলো, আপনিও তার তেমন ক্ষতি করলেন। এটা ইসলামে অনুমোদিত। কেউ আপনার ক্ষতি করলে আপনি তার জন্য বদদু'আ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কার কাফিররা যখন শারীরিক নির্যাতন করেছে, তিনি তখন তাদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করেন। যাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করেন, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। [সহীহ বুখারী: ৩৮৫৪]

৩। আপনার ওপর কেউ যুলুম করলে আপনি দুনিয়াতে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু, কিয়ামতের দিন তার নেক আমলের বিনিময় গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, আপনি বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম। কিয়ামতের দিন তোমাকে দেখে নেবো'। এটাও ইসলামে অনুমোদিত। যেসব অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনি কিছু করতে পারবেন না, আপনি তাদের বিরুদ্ধে এমনটা করতে পারেন।

৪। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন না। এটাও ইসলামে অনুমোদিত। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে ওয়াহশি। ওয়াহশি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা। ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, "আমার সামনে থেকে কি তোমার চেহেরা সরিয়ে রাখতে পারো?" [সহীহ বুখারী: ৪০৭২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আআইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করলেও তাঁর আচরণটি ভুলতে পারেন না। ফলে, তিনি ওয়াহশির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেননি।

এরকম ক্ষেত্রে কেউ যদি আপনার কাছে ক্ষমা চায়, আপনি যদি আপনি কাউকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে তার বিনিময়ে আপনি সওয়াব পাবেন।

৫। আপনি ক্ষমা করে দিবেন এবং সুসম্পর্ক বজার রাখবেন। এটা হলো ক্ষমাশীলতার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

মিসতাহ ইবনু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মা উম্মু মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মু মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালা। সেই হিশেবে মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালাতো ভাই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খালাতো ভাই মিসতাহর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভরণ-পোষণ করতেন।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুনাফিকরা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অপবাদ দেয়। অপবাদের গুজব পুরো মদীনায় রটে যায়। মুনাফিকদের প্ররোচনায় পড়ে কয়েকজন সাহাবীও গুজব রটাতে শুরু করেন। তাঁরাও আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেন!

অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসতাহ ইবনু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে আর্থিক সাহায্য করেন, সেই ব্যক্তি কিনা তাঁর মেয়ের চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটনা করেন, অপবাদ বলে বেড়ান! আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন। সবাই বুঝতে পারলেন যে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে যা বলা হয়েছিলো এটা স্রেফ অপবাদ; এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই।

কুরআনের আয়াত নাযিল হবার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বলেন, "আল্লাহর কসম! মিসতাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেহেতু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে অপবাদ রটিয়েছে, সেহেতু আমি তাঁর জন্য কখনো কিছু খরচ করবো না!"

যে ব্যক্তিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর্থিক সাহায্য করেন, সেই ব্যক্তি তাঁর মেয়ের বদনাম করেছে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন রি-অ্যাকশন তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু, আল্লাহ চাইলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষ যেনো শ্রেষ্ঠ আচরণ করেন। আল্লাহ নিজেই ক্ষমাশীল, মানুষও যেনো এই ক্ষমাশীলতার গুণটি আয়ত্ত করতে পারে।

আল্লাহ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একটা আয়াত নাযিল করেন।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেনো শপথ না গ্রহণ করে যে, তাঁরা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাঁদের কিছুই দেবে না। তাঁরা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আন-নূর ২৪:২২]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই উঠে না, কোনোভাবেই যাকে ক্ষমা করা যায় না, সেই তাঁর ব্যাপারেও আল্লাহ বলছেন- 'তাঁকে ক্ষমা করে দাও'। তাঁকে ক্ষমা করে দিলে কী হবে? আল্লাহ পাল্টা প্রতিদানের কথা বলছেন 'এতে করে আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন'।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর এমন ঘোষণা শুনে বললেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন এটা আমি পছন্দ করি।" যেই মিসতাহকে রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি আর সাহায্য

করবেন না বলেছিলেন, আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির ঘোষণা শুনে তাঁকে আগের মতো আর্থিক সাহায্য করা শুরু করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার পাল্টা কসম করেন,

"আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খরচ দেয়া কখনো বন্ধ করবো না।" [সহীহ বুখারী: ৬৬৭৯]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মেয়ের ওপর অপবাদ আরোপকারীকে ক্ষমা করে দেন। এ থেকে আমরা শিখতে পারি, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমরাও চাইলে ক্ষমা করতে পারি। আমাদের প্রতি কেউ কি এমন অন্যায় করেছে, যা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশি? ক্ষমা প্রদর্শন করে আমরা উত্তম আচরণ করতে পারি।

মানুষকে ক্ষমা করলে কী লাভ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে উৎসাহ দেন:

"অন্যকে ক্ষমা করো, (তাহলে) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৬৫৪১]

আমরা অন্যকে ক্ষমা করবো এজনই, যাতে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করেন।

মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ

মুমিনের একটি গুণ হলো সে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করবে। আল্লাহ এই গুণের প্রতি উৎসাহ দিয়ে পবিত্র কুরআনে অনেকগুলো আয়াত নাযিল করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا

"যমিনে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনো যমিনে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছাতে পারবে না।" [সূরা আল-ইসরা ১৭: ৩৭]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জানিয়ে দেন, আমরা যেন সম্মানজনক পদ্ধতিতে হাঁটাচলা করি। এমনভাবে না হাঁটি, যেন হাঁটার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। আবার এমনভাবে যেন না হাঁটি, লোকজন আমাদেরকে দুর্বল ভাবে।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে লুকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে উপদেশ দেন:

وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ

"আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। তোমার আওয়াজ নিচু করো। নিশ্চয়ই সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।" [সূরা লুকমান ৩১: ১৯]

আমরা যখন কথা বলবো, তখন এতো জোরে কথা বলবো না আবার এতো আস্তেও কথা বলবো না। আল্লাহ গাধার উদাহরণ দিয়ে বলেন, গাধার আওয়াজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের আওয়াজ যেন এমন না হয়।

আমাদেরকে কথা বলা, চলার ক্ষেত্রে যেমন মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, তেমনি ইবাদাতের ক্ষেত্রেও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছিলেন। কয়েকজন সাহাবী একটু দেরিতে মসজিদে আসেন। নামাজের রাকআত পাবার জন্য তারা দৌড়ে মসজিদে আসেন।

নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا."

"নামাজের জন্য ইকামত দেয়া হয়ে গেলে তোমরা দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াহুড়ো করে নামাজে এসো না। বরং প্রশান্তিসহ গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে নামাজে শরীক হও। অতঃপর ইমামের সাথে যতোটা নামাজ পাও, তা আদায় করো। আর যতোটা না পাবে, তা পূরণ করে নাও। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাজ আদায়ের সংকল্প করে, তখন সে নামাজরত থাকে বলে গণ্য হয়।" [সহীহ মুসলিম: ১২৪৭]

আমরা এখনো দেখতে পাই, মানুষ নামাজে জামআত পাবার জন্য দৌড়ে দৌড়ে আসে; যা দেখতে খুব বিদঘুটে দেখায়। এটা সুন্নাত না। সুন্নাত হলো- ধীরেসুস্থে যাওয়া, গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে যাওয়া। হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা থেকে মুজদালিফায় যাচ্ছেন। তখন পেছন থেকে খুব বেশি হাঁকডাক ও উট পেটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। সাহাবীরা খুব দ্রুতগতিতে উট হাঁকাচ্ছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে চাবুক দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন:

"হে লোকসকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো। কেননা, উট দ্রুত হাকানোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" [সহীহ বুখারী: ১৬৭১]

ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলে প্রশান্তি পাওয়া যায়। ইবাদাতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাড়াহুড়ো করতে বলেননি। আমরা যেন ধীরেসুস্থে ইবাদাত করি, তাহলে অন্যের ইবাদাতে ব্যাঘাত ঘটবে না।

'সাকিনা' আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়। আল্লাহ মুমিনের মনে সাকিনা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাতে দেখা যায়, যেকোনো দুর্যোগের মুহূর্তে আল্লাহ সাহাবীদের অন্তরে সাকিনা নাযিল করেন। যেমন: হুনাইন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর।" [সূরা আত-তাওবা ৯: ২৬]

বাইয়াতুর রিদওয়ানের সময়ও আল্লাহ সাকিনা নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন:

"মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিলো তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি।" [সূরা আল-ফাতহ ৪৮: ১৮]

মক্কা বিজয়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

“যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিলো, জাহিলী যুগের অহমিকা। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন।” [সূরা আল-ফাতহ ৪৮: ২৬]

মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিমদের প্রতি যদি আল্লাহ প্রশান্তি নাযিল না করতেন, তাহলে হয়তো অনেক হত্যাযজ্ঞ হতো। কারণ, মক্কাবাসীর অত্যাচারের কারণে সাহাবীরা হিজরত করেছেন। এখন বিজয়ীর বেশে তারা মক্কায় ফিরেন। তারা চাইলে মক্কাবাসীকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের ওপর সাকিনা নাযিল করেন।

মর্যাদাপূর্ণ আচরণের দুটো দিক আছে। একটি হলো শারঈ দিক, আরেকটি হলো সাংস্কৃতিক। যেমন: ইসলামি শরীয়ত আমাদেরকে বলে- আমরা গালাগালি করতে পারবো না, কটু কথা বলতে পারবো না, মিথ্যা বলতে পারবো না ইত্যাদি। পৃথিবীর যে দেশেই থাকুন না কেনো, আপনার ক্ষেত্রে এগুলো মেনে চলতে হবে।

আবার কিছু দিক আছে সাংস্কৃতিক। যেমন: ভাষা, শব্দ। এক অঞ্চলের একটি ভাষা খুবই সম্মানজন, আরেক অঞ্চলে সেটা হয়তো তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য বলা হয়ে থাকে, ‘এক দেশের গালি, আরেক দেশের বুলি’।

আপনি যেখানে বসবাস করেন, সেখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার পর্যাপ্ত জানাশোনা থাকতে হবে, বুঝাপড়া থাকতে হবে।

যেমন: কাপড় পরার ক্ষেত্রে। পৃথিবীর একেক দেশের মুসলিমগণ একেক ধরনের পোশাক পরেন। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমগণ এক ধরনের পোশাক পরেন, মধ্যপ্রাচ্য-আরবের মুসলিমগণ আরেক ধরনের পোশাক। উপমহাদেশের মুসলিমগণ এক ধরনের পোশাক পরেন, ইউরোপ-অ্যামেরিকার মুসলিমগণ আরেক ধরনের পোশাক।

উপমহাদেশের সাধারণ মুসলিম পাঞ্জাবি, ফতোয়া, শার্ট পরে। অন্যদিকে, আরবের সাধারণ মুসলিমরা জুব্বা পরে। অ্যামেরিকায় থাকতে যে পোশাক পরে আমি জুমুআর নামাজে যেতাম, সৌদি আরব গিয়ে দেখি এমন পোশাক পরে কেউ জুমুআয় আসেনা; এমন পোশাক তারা বাসায় পরে।

আপনি এসব ক্ষেত্রে সেই পোশাক পরুন, যে পোশাকটি আপনার অঞ্চলের মুসলিমরা পরে। তবে, অবশ্যই সেই পোশাকের সাথে ইসলাম পোশাকের যে নির্দেশনা দিয়েছে, তার সাথে যেন সাংঘর্ষিক না হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহর মতে:

সুন্নাতসম্মত পোশাক হলো আপনার এলাকার লোকজনের পোশাক পরা; যতোক্ষণ পর্যন্ত সেই পোশাক পরতে শরীয়ত অনুমোদন দেয়।

একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। তার পোশাক ছিলো জীর্ণ, জোড়াতালি দেয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কাছে কি অর্থ নেই?”

সে জানালো, তার কাছে অর্থ আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, অর্থ থাকা সত্ত্বেও লোকটি ভালো পোশাক পরে না। এরকম কাজ আমাদের অনেকেই করে। তারা মনে করে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জোড়াতালি দেয়া জামা পরা উত্তম। এই ধারণা ঠিক নয়।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে বলেন:
"আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন তার (নিয়ামতের) নিদর্শন তার মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন।" [বুলগুল মারাম: ৫৩০]
একজন মুসলিম এমন কোনো পোশাক পরতে পারে না, যা দেখে লোকজন বলে, 'এই দেখো, ও কী পরেছে!' একজন মুসলিম এমনভাবে কথা বলতে পারে না, যা অসম্মান বয়ে আনে। একজন মুসলিম এমন কাজ করতে পারে না, যা তার নিজের জন্য ও মুসলিম জাতির জন্য লজ্জাকর। মুসলিম সবসময় সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে জীবনযাপন করে। তার হাঁটা-চলা, কথা বলা, চুপ থাকা, জামা পরা সবকিছু হতে হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ, সম্মানজনক। তার যতোটুকু সামর্থ্য আছে, সামর্থ্য যেন তার সবকিছুর মধ্যে প্রকাশিত হয়। কারণ, আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, সেই নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে আল্লাহ পছন্দ করেন।

দানশীলতা

মুমিনের অন্যতম গুণাবলী হলো দানশীলতা। এই গুণকে 'আখলাকের রাণী' বলা যায়। অন্যকে এমনভাবে দান করতে হবে, তার কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করা যাবে না। দান করার পর আশা করতে হবে আল্লাহর কাছে। এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে দান করবেন।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আনসারদের প্রশংসা করেন। তারা মুহাজিরদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলো, খাবারের ব্যবস্থা করেছিলো। আল্লাহ বলেন:
وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। [সূরা আল-হাশর ৫৯: ৯]
আমরা যখন কোনো কিছু দান করি, মনে মনে বলি- 'টাকাটা থাকলে এটা কিনতে পারতাম'। দান করার পরও টাকার প্রতি একধরনের আকর্ষণ থেকে যায়। কিন্তু, আনসারদের ব্যাপারটি ছিলো একেবারে ভিন্ন। তারা হাত দিয়ে যেমন দান করে, মন দিয়েও তেমন দান করে। ফলে, দান করার পর তাদের মনের মধ্যে কোনো অশান্তি ছিলো না, আফসোস ছিলো না।
তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত ছিলো। নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা মুহাজির ভাইদেরকে দান করে। মনে করুন, বাসায় বিরিয়ানী রান্না করেছেন। অনেকদিন ধরে আপনি বিরিয়ানী খান না। কিন্তু, রান্না

পর পুরো খাবারটি অন্যকে দিয়ে দিলেন। খাবার দান করার পর আপনার মনে কোনো আফসোস নেই, 'ইশ! একটু যদি খেয়ে দেখতাম'। আনসারদের দান ছিলো এমন।

এই আয়াত থেকে দুটো বিষয় বুঝা যায়।

মন থেকে দান করা

আপনার কাছে যা পছন্দনীয়, তা দান করা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলেন:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা আলে-ইমরান ৩: ৯২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন আবু তালহা। তিনি ছিলেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৎ বাবা। আয়াতটি শুনার পর আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যান। তাঁকে গিয়ে বলেন:

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! মসজিদে নববীর পাশে 'বায়রুহা' নামক বাগানটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।"

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনেকগুলো বাগান ছিলো। তারমধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগান 'বায়রুহা'। উল্লেখ্য, সাহাবীরা তাঁদের পোষা প্রাণী এমনকি বাগানগুলোর নামকরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর পোষা প্রাণীর নাম রাখতেন।

আপনি যদি মসজিদে নববীর পেছনের দরজা কিং ফাহাদ গেইট দিয়ে প্রবেশ করেন, সেখান থেকে বামদিকে ১৫০ ফুট হাঁটেন, তাহলে দেখতে পাবেন 'বায়রুহা' বাগানটি। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। তিনি বলেন, "এটা আল্লাহর নামে সদকা করা হলো, আমি এর দ্বারা কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই, আপনি যাকে দান করলে ভালো মনে হয় তাকে দান করুন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালহার দানকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন:

"তোমাকে ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এটা হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছো তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।" [সহীহ বুখারী: ১৪৬১]

পবিত্র কুরআনের প্রথমদিকের নাযিল হওয়া একটি সূরায় আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করেন। কেননা, তারা নিজের খাবার অনাহারীর মুখে বিলিয়ে দেয়; যদিও ঐ খাবারের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।" [সূরা আল-ইনসান ৭৬: ৮]

খাবার দেবার পর তারা জানিয়ে দেয়:

"আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।" [সূরা আল-ইনসান ৭৬: ৯]

দানশীলতার গুণটি আল্লাহ পছন্দ করেন। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো ‘আল-কারীম’। কুরআনকে ‘কারীম’ নামে ডাকা হয়। জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ‘কারীম’ নামে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘কারীম’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘কারাম’ সাধারনত দুই ধরণের হতে পারে।

দান-সাদকা করা হলো কারাম।

পরিবারের সাথে, আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করা হলো কারাম। অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বললে, প্রয়োজনে এগিয়ে গেলে, আন্তরিকতা দেখানোটা দান-সাদকার সমপর্যায়ের। আপনি যদি আর্থিকভাবে দান-সাদকা করতে না পারেন, এই কাজগুলো করে দান-সাদকার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন করতে পারেন। পরিবারের পেছনে ব্যয় করলেও সাদকার সওয়াব পাবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ." َ

তিনি বলেন, রসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার গোলাম আযাদ করার জন্য এবং একটি দীনার মিসকীনদেরকে দান করলে এবং আর একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে (সাওয়াবের দিক থেকে) ওই দীনারটিই উত্তম যা তুমি পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করলে। [সহীহ মুসলিম: ২২০১]

দানশীলতার গুণটি পরিবার থেকে শুরু করতে হবে, তারপর সমাজ। আমরা পরিবারের লোকদের জন্য যেমন ব্যয় করবো, তেমনি ব্যয় করবো বাইরের লোকজনের মধ্যে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে দানশীলতার গুণটি বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিলো অন্যকে দান করে। নিজের দিকটা চিন্তা না করে তিনি অন্যের জন্য দান করতেন। তাঁর দানশীলতার বৈশিষ্ট্য একটি হাদীস থেকে সহজে বুঝা যায়।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোনো জিনিস চাওয়া হলে, তিনি কখনোই ‘না’ বলেননি।” [সহীহ বুখারী: ৬০৩৪]

অর্থাৎ, নবিজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে কেউ কিছু চাইতে আসলে তিনি নিঃসঙ্কোচে সেটা দিয়ে দিতেন; ধমক দেওয়া তো অনেক দূরের কথা!

মনে করুন, আপনি খুব শখ করে একটি মোবাইল কিনলেন। অনেকদিনের জমানো টাকা দিয়ে কেনা মোবাইল। টাকা বাঁচাতে গিয়ে অনেকসময় দুই কিলোমিটার রাস্তা গাড়িতে না চড়ে হেঁটেছেন,

দুপুরের খাবারে মুরগি খাবার জন্য লোভাতুর জিহ্বা সংবরণ করেছেন। মোবাইলটি মার্কেট থেকে কেনার পর কিছুক্ষণ ব্যবহার করলেন। নতুন মোবাইল, ব্যবহার করতে পেরে আপনি বেশ এক্সাইটেড।

হঠাৎ আপনার এক বন্ধু এসে বললো, "দোস্ত, তোর মোবাইলটি তো অনেক সুন্দর। আমাকে দিয়ে দেয় না, প্লিজ।" বন্ধুর আবদার শুনে আপনার কেমন লাগবে? সে যদি সত্যি বারবার বলতে থাকে, আপনি তো রাগে গড়গড় করবেন। আবদার বাড়তে থাকলে একসময় হয়তো ধমক দিবেন। এমনটাই তো স্বাভাবিক।

একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি চাদর উপহার দিলেন। চাদরটি ঝালরসহ বুনা। এমনিতেই রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদরটি খুব প্রয়োজন, আর মহিলাটিও শখ করে চাদরটি দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবেন বলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরলেন। এমন সুন্দর পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন, সাহাবীরাও নিশ্চয় রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন চাদর পরতে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন।

এমন সময় একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাদরটি তো অন্নেক সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো জীবনে যে কয়বার সুন্দর, দামী জামা পরেছিলেন, এটি ছিলো তারমধ্যে একটি। ঠিক এমন মুহূর্তে এই আবদার শুনে তিনি কী বলবেন? তাঁর কি রাগ করা উচিত? ঐ সাহাবীকে ধমক দেওয়া উচিত?

না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ।" অর্থাৎ, চাদরটি নিয়ে নিও। এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন (সাহাবী চাদরটি পেয়ে যান)। [সহীহ বুখারী: ৬০৩৬]

বাকি সাহাবীরা তখন ঐ সাহাবীকে বললেন, "তুমি কাজটি ঠিক করোনি। তুমি দেখলে যে, চাদরটি তাঁর প্রয়োজন, এরপরও তুমি সেটা চাইলে? অথচ তুমি জানো যে, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি 'না' করেন না।"

ঐ সাহাবী জবাব দিলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা পরছেন, তখন তাঁর বরকত লাভের জন্য আমি এটা চাই। যাতে এই চাদরে আমাকে দাফন করা হয়।" [সহীহ বুখারী: ৬০৩৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো এতো দান করতেন যে, সাহাবীরা পর্যন্ত জানতেন, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি ফিরিয়ে দেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর ঘরে ছিলো মাত্র ৭ দিরহাম। আমাদের সময়ে একেক দিরহাম হবে ৪০০ টাকার মতো। ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ছিলো মাত্র ৩০০০ টাকার মতো। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু

আনহুকে বলেন সেগুলো দান করে দিতে। তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে চান একেবারে খালি হাতে। এই মুদ্রাগুলোও রাখতে চান না।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন বায়তুলমাল থেকে ভাতা পেতেন, সাথে সাথে দান করে দিতেন। নিজের জন্য কিছু রাখতেন না। প্রায় সকল সাহাবীদের জীবনী পড়লে দানশীলতার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যকে দান করা, সম্মান দেখানোকে ঈমানের সাথে যুক্ত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন:

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানকে যথাযথ খাতির করে। [সহীহ বুখারী: ৬০১৯]

আপনি ভালো ঈমানদার হতে চাইলে প্রতিবেশীকে সম্মান করতে হবে, মেহমানকে আদর-আপ্যায়ন করতে হবে, গরীবকে দান করতে হবে, খাওয়াতে হবে।

অন্যকে দান করা বলতে শুধুমাত্র টাকা দান করা বুঝায় না। আপনি ‘সময়’ দান করতে পারেন, ‘মেধা’ দান করতে পারেন। কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে যান, কেউ সমস্যায় পড়লে আপনার মেধা দিয়ে তার সেই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করুন। এগুলোর ফলেও সাদকার সওয়াব পাবেন।

আপনি যখন মানুষের প্রতি উদার আচরণ করবেন, দান করবেন, তখন কী হবে? আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন, মানুষজন আপনাকে ভালোবাসবে। আমরা যদি কোনো ভুল করি, মানুষজন সুন্দর করে সংশোধন করে দিবে বা সেগুলো এড়িয়ে যাবে।

আল্লাহর জন্য দান করে আমরা একইসাথে আল্লাহর ভালোবাসা পাবো এবং মানুষজনও আমাদেরকে ভালোবাসবে। দান করবো আল্লাহর জন্য, সাথে মানুষের ভালোবাসাও পাবো!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“আল্লাহ দানশীল, তিনি দানশীলতাকে ভালোবাসেন।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৭৯৯]

আল্লাহ যখন আপনাকে ভালোবাসবে, তখন ফেরেশতা, মানুষজনও আপনাকে ভালোবাসবে। অন্যদিকে, আপনার উত্তম আখলাকের জন্য মানুষজন যখন আপনাকে ভালোবাসবে, তখন আল্লাহও আপনাকে ভালোবাসবেন।

অন্যের সাথে পরামর্শ করা

অন্যের সাথে পরামর্শ করা হলো মুমিনের একটি গুণ। মুমিন চিন্তা-ভাবনা ছাড়া, অন্যের সাথে পরামর্শ না করে বড়ো কোনো কাজ করে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতে বলেন।

আল্লাহ বলেন:

“কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।” [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৫৯]

এই আয়াতে আল্লাহ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেন, তেমনি মুমিনদেরকেও জানিয়ে দেন কাজে-কর্মে পরামর্শ করতে।

মুমিনদের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

"যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামাজ কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে...।" [সূরা আশ-শুরা ৪২: ৩৮]

একজন মুমিন একা একা সিদ্ধান্ত নেয় না, সে চারপাশের পরিবেশ অবজ্ঞা করে যেমন মন চায় তেমন কাজ করে না। কোনো কাজ করতে গেলে সে তার পরিবার, বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে পরামর্শ করে তারপর ঐ কাজের দিকে পা বাড়ায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরো জীবনী পড়লে দেখা যায়, তিনি প্রতিটি বড়ো বড়ো ক্ষেত্রে সাহাবীদের পরামর্শ চেয়েছেন। সাহাবীরা কোনো পরামর্শ দিলে তিনি গুরুত্বের সাথে পরামর্শটি গ্রহণ করেন। যেমন:

বদর যুদ্ধ শুরুর আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের পরামর্শ চান।

বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দিদের কী করা হবে সে ব্যাপারে সাহাবীদের পরামর্শ চান। আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পরামর্শ দেন।

উহুদ যুদ্ধে সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

খন্দক যুদ্ধে যুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কে সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দেন।

হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিধবা হবার পর তাঁকে বিয়ে করার ব্যাপারে আবু বকর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে পরামর্শ করেন।

ইফকের ঘটনার সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে পরামর্শ করেন।

স্ত্রীদের তালাকের ব্যাপারে যায়িদ ইবনে হারিসা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে পরামর্শ করেন। তালাকের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হলে তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন, সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি যেন পরিবারের সাথে পরামর্শ করেন।

তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল, ওহি দ্বারা পরিচালিত। তারপরও তিনি মানুষের সাথে পরামর্শ করেন। আর আমরা সবসময় ভুল করি, যেকোনো কাজে ভুল হতে পারে। সেই হিশেবে আমাদের আরো বেশি পরামর্শ করা দরকার।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে কাউকে এতো বেশি পরামর্শ করতে দেখিনি।" [মুসনাদে আহমাদ: ১৭৯২৮]

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিলো সাহাবীদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। সবাই আশা করে এসেছিলেন কা'বা ঘরে তাওয়াফ করবেন। কিন্তু, সন্ধি করে সেবারের যাত্রা স্থগিত করা হয়। পরেরবার যাবেন। সাহাবীরা সেটা মেনে নিতে পারছেন না। সবচেয়ে কঠোর আপত্তি জানান উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে কুরবানি করার ও মাথা মুণ্ডনের নির্দেশ দেন। তিনি তিনবার নির্দেশ দেন, কিন্তু সাহাবীরা কেউ উঠলেন না। তারা খুব হতাশ ছিলেন।

সেই সফরে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের আচরণের কথা তাঁকে বললেন। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে পরামর্শ দেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে গিয়ে তাঁদের সাথে কোনো কথা না বলে উট কুরবানি করুন ও ক্ষুরাকার ডেকে মাথা মুণ্ডন করুন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর কথামতো তাই করলেন। তাঁকে দেখে সাহাবীরা এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং তারাও তাঁর অনুসরণ করলেন। [সহীহ বুখারী: ২৭৩১]

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ধরণের নেতৃত্বের পরামর্শ দেন, সেটা হলো- 'Leading by example' বা উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বদান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; যার ওপর আল্লাহর ওহী নাযিল হয়, তিনি পর্যন্ত স্ত্রীর পরামর্শ আমলে নেন। স্ত্রীর পরামর্শ নিতে কোনো ধরণের সঙ্কোচবোধ করেননি।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতো বড়ো পরামর্শ দিতে ইতস্তবোধ করেননি। তিনি এটাও মনে করেননি যে, 'আমি আর কী বলবো, আপনি যা ভালো মনে করেন করুন' বা 'আল্লাহ আপনার ওপর ওহী নাযিল করে হয়তো জানিয়ে দিবেন'। তিনি বরং পরামর্শ দেন। তাঁর মনে হয়েছিলো এই পরামর্শ কাজে দিতে পারে। ফলে নিঃসংকোচিত্তে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বদানের পরামর্শ দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তিনি নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রীরা তাঁর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারতেন, যেকোনো বিষয় শেয়ার করতে পারতেন।

খুলাফায়ে রাশেদার জীবনীতেও দেখা যায়, তারা সবসময় মানুষের উপদেশ গ্রহণ করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রথম ভাষণে মানুষের পরামর্শ চান, খিলাফত পরিচালনা করতে গিয়ে সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুরো খিলাফতকাল ছিলো সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে। বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে সবার সাথে কথা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের মুসহাফ সংকলন করতে গিয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন।

যেকোনো কাজে পরামর্শ শেষে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তারপর যদি খারাপ ফল আসে, তাহলে যেন পরামর্শদাতাদের দোষারোপ করা না হয়। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়, আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হয়।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

"যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে।" [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১৫৯]

কেউ যদি আমাদের কাছে কোনো পরামর্শ চাইতে আসে, আমরা যেন পরামর্শ দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চাইলে সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়।" [সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৪৭]

কেউ আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসলে আপনি তাকে পরামর্শ দিতে হবে এবং সঠিক পরামর্শটি দিতে হবে। আপনি জেনেবুঝে তাকে কোনো ভুল পরামর্শ দিতে পারেন না।

অন্যদিকে, কেউ যখন কোনো ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে আসে, সেটা তখন আমানত হয়ে যায়। একজন এসে একটি ব্যবসার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলো, আপনি পরামর্শ দিলেন। তারপর ঐ ব্যবসার প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর কাছে আপনার পরামর্শের কথা বলে ফেললেন। ফলে, যে পরামর্শ চাইতে আসলো, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এমনটা করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"যে ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, সে একজন আমানতদার।" [জামে আত-তিরমিজি: ২৮২২]

আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। আপনি একজনের পরামর্শ, প্ল্যানের কথা আরেকজনকে জানিয়ে দিচ্ছেন। এটা হলো আমানতের খেয়ানত। এগুলোকে ছোটোখাটো মনে করার কোনো কারণ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো একটি পরামর্শ পাবার পর সেটা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক?

উত্তর হলো- না। পরামর্শ চাইতে পারেন, কিন্তু মানুষ যে পরামর্শ দিবে সেটা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পরামর্শটি যদি যৌক্তিক মনে হয় গ্রহণ করবেন, যৌক্তিক মনে না হলে গ্রহণ করবেন না।

সব মানুষ সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না। একটি বিষয়ে সবাই উত্তম পরামর্শ দিতে পারে না। হতে পারে কারো একটি পরামর্শের একটি অনশ আপনার পছন্দ হয়েছে, সেই অংশের আলোকে আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন।

একজন আলেম বলেন:

"আপনি যখন কারো কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন, আপনি তখন তার বুদ্ধিমত্তা ধার নিচ্ছেন।"

তার সারা জীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার আলোকে সে আপনাকে পরামর্শ দিবে। আপনি সেই পরামর্শ চাইতেই পেয়ে গেলেন।

পরামর্শের আরবি হলো 'শূরা'। শূরার সাথে আরেকটি কাজ করতে হবে, সেটা হলো ইস্তিখারা। ইস্তিখারা ব্যক্তিগত আমল, শূরা সামষ্টিক আমল। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দুটো বিবেচনা করতে হবে।

যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ কেবলমাত্র তাদের সাথে করতে হবে, যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন। আপনি যাকে বিশ্বাস করেন, যার ওপর ভরসা করেন না, তার সাথে পরামর্শ করতে যাবেন না। হতে পারে সে আপনার ক্ষতি করতে পারে বা তার উত্তম পরামর্শ আপনার মনঃপুত হবে না।

ইস্তিখারা ও শূরার পর আপনি যে সিদ্ধান্ত নেন, সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এরপর দ্বিধা করলে হবে না। আপনাকে সিদ্ধান্তে অটুট থাকতে হবে। যদি ফল খারাপ আসে, হয়তোবা এই খারাপ ফলের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে আপনি যা বুঝতে পারছেন না। ফল ভালো করার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, এটাই যথেষ্ট। তারপর যে ফল আসে, সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়াই উত্তম।

আপনি যখন কারো সাথে পরামর্শ করতে যাবেন, এর মাধ্যমে তার প্রতি আপনার ভালোবাসা ও আস্থার জানান দিলেন। ফলে, তার সাথে আপনার সম্পর্ক মজবুত হবে। অন্যদিকে, কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে, তার ব্যাপারেও আপনি উত্তম ধারণা রাখবেন, তার সাথেও সম্পর্ক মজবুত হবে।

তারমানে দেখা যায়, পরামর্শ গ্রহণের আমলটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি, তেমনি পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যও জরুরি।

অন্যকে ভালোবাসা

এক যুবক ইসলাম শেখার জন্য দামেস্ক যান। তিনি অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিলো আবু ইদ্রিস আল-খাওলানী। পরবর্তীতে তিনি উমাইয়া খিলাফতের প্রধান বিচারপতি হন। যুবক অবস্থায় তিনি যখন দামেস্কের গ্র্যান্ড মসজিদে যান, তিনি দেখতে পান একটি হালাকায় অনেকেই বসে আছেন, একজন শায়খ সেখানে পড়াচ্ছেন। সেই শায়খ ছিলেন খুব কম বয়সী। তাঁকে দেখামাত্র তিনি পছন্দ করেন। তিনি অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কে?"

তাকে বলা হলো- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আবু ইদ্রিস আল-খাওলানী রাহিমাহুল্লাহ মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করার জন্য পরদিন আগে আগে মসজিদে যান। গিয়ে দেখতে পান মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়ছেন।

নামাজ শেষে তাঁকে বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালোবাসি।"

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর কসম?" অর্থাৎ, এতোটা নিশ্চিত হয়ে বলছো যে, তুমি আমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো?

"জ্বি, আল্লাহর কসম।"

"আল্লাহর কসম?"

"জ্বি, আল্লাহর কসম।"

অতঃপর মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চাদরের আঁচল ধরে টেনে বললেন, "তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করুন।"

এই বলে মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু ইদ্রিস আল-খাওলানী রাহিমাহুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস শুনান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, যারা আমার জন্য একসাথে বসে, যারা আমার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করে, যারা আমার জন্য একে অন্যের জন্য ব্যয় করে।” [মুসনাদে আহমাদ: ২১৫২৫]

মুমিনের আখলাক নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য কী? কেনো একজন মুমিন আরেকজনের সাথে ভালো আচরণ করবে? এটার মূল কারণ হতে হবে- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। একজন মুমিন আরেকজনকে ভালোবাসলে তবেই তার সাথে উত্তম আচরণ করতে পারবে। আরেকজনের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে কিভাবে তার প্রতি দানশীল আচরণ করতে পারে? তাকে উত্তম পরামর্শ দিতে পারে? দোষ গোপন রাখতে পারে? ক্ষমা করে দিতে পারে?

তারমানে বুঝা গেলো, সব উত্তম আখলাকের মূল হলো ভালোবাসা। অন্যের প্রতি ভালোবাসার কারণে মানুষ অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে।” [সহীহ মুসলিম: ৯৮]

অন্য মুমিনকেকে ভালোবাসা নফল কোনো ইবাদত নয়, এটা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি অন্য মুমিনকেকে যদি না ভালোবাসেন, প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবেন না। প্রকৃত ঈমানদার না হলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না। জান্নাতে যাবার আকাঙ্ক্ষা করলে আপনাকে অবশ্যই মুমিনদেরকে ভালোবাসতে হবে।

এটা তখন আর ‘আখলাক’ থাকে না, এটা হয়ে যায় ‘আকীদা’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীর কথা বললেন, যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অন্য একজন সাহাবী জানতে চাইলেন তাঁর আমল কী। তিনি তাঁর সাথে দেখা করলেন তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে। গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি অতিরিক্ত নামাজ পড়েন না, ইবাদাত করেন না। তাহলে কিসের জন্য তিনি জান্নাত লাভ করবেন?

তিনি জানালেন যে, তিনি অন্য মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। এই কারণে তিনি জান্নাত লাভ করবেন। [মুসনাদে আহমাদ: ১২২৮৬]

পূর্ববর্তী যুগের এক লোক একবার তাঁর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আরেক গ্রামে যায়। আল্লাহ মানুষ রূপে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, “তুমি কোথায় যাচ্ছো?”

“আমি অমুক গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।”

“তার কাছে কি তোমার কোনো আবদার আছে? তুমি কোনো কিছু পাবার জন্য তার কাছে যাচ্ছো?”

“না, আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবাসি।”

ফেরেশতা তাকে জানালেন:

“আমি আল্লাহর ফেরেশতা, তোমাকে অবহিত করার জন্য এসেছি যে- আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছো।” [সহীহ মুসলিম:৬৪৪৩]

লোকটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার ভাইকে পছন্দ করতো, ফলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন, তাকে তাঁর প্রিয় বান্দার অন্তর্ভুক্ত করেন।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে এরচেয়েও বেশি মর্যাদা রয়েছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“আল্লাহ বলেন- আমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে নূরের মিম্বার। নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবে।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৩৯০]
এই একটি আমলের ফলে নবী-শহীদগণ মুমিনদের ওপর ঈর্ষান্বিত হবে। আর তা হলো- আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা।
আপনার ঈমানের পূর্ণতা পাবে, আপনি যদি কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন। আপনি ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারবেন, আপনি যদি কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন।
আপনি যদি কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন, তাহলে অটোম্যাটিক জান্নাতে তার সাথে থাকতে পারবেন। আপনার জান্নাতে থাকার মর্যাদা হয়তো নিচু স্তরে হতে পারে, কিন্তু কাউকে ভালোবাসার কারনে, তার প্রতি দয়া-মমতার জন্য আল্লাহ আপনাকে তার সাথে রাখবেন।
একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এসে জিজ্ঞেস করলো, “কিয়ামত কখন হবে?”
তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, “কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করেছো?” সে বললো,
“আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি।”
এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,
“যাকে তুমি ভালোবাসো, তাঁর সাথেই তোমার কিয়ামত হবে (অর্থাৎ তোমার সঙ্গী)।”
এই হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শুনেন টিন-এইজে।
পরবর্তীতে হাদীসটি বর্ণনার সময় তিনি বলেন
“আমার কাছে এই হাদীসের চেয়ে প্রিয় আর কোনো হাদীস নেই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আবু বকর, উমরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ভালোবাসি। আমি আশা করি, তাঁদেরকে ভালোবাসি বলে আমি তাঁদের সাথে জান্নাতে বসবাস করতে পারবো; যদিও তাঁদের আমলের মতো আমি আমল করতে পারিনি।” [সহীহ বুখারী: ৩৬৮৮]
আপনি যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসেন, তাহলে তাঁর মতো ইবাদাত না করেও জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হতে পারেন। এটা হলো অন্যকে ভালোবাসার সবচেয়ে বড়ো ফযিলত। আপনি একজন আলেমকে ভালোবাসেন? তাঁর মতো আমল না করেও জান্নাতে তার সঙ্গী হতে পারেন; শুধুমাত্র তার প্রতি ভালোবাসার কারণে।
আমরা অনেকসময় শুধুমাত্র ইবাদাত (নামাজ, রোজা, যিকির) নিয়ে কথা বলি, কিন্তু আখলাক নিয়ে কথা বলি না। ইসলাম যেমন ইবাদাতের নাম, তেমনি আখলাকেরও নাম। আমল ও আখলাকের সমন্বয়ে ইসলাম।
রামাদ্বান চলে যাবে, কিন্তু আমাদের আমল ও আখলাক রয়ে যাবে। এই দুটোকে যদি একসাথে সমন্বয় করতে পারি, তবেই আমরা জান্নাতের আশা করতে পারি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটা পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।” [সহীহ বুখারী: ১৩]

অন্যকে সালাম দেয়া

মুমিনের একটি সহজ গুণ হলো, সে অন্যকে সালাম দেয়। সে অপেক্ষা করে না যে, তাকে কেউ সালাম দিবে। অন্য কেউ তাকে সালাম দেবার আগে সে নিজেই সালামের সূচনা করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর প্রথম যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণে তিনি বলেন:

“হে মানুষগণ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান করো, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজ আদায় করো। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহজে জান্নাত লাভ করবে।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৪৮৫]

মদীনার হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম নির্দেশ ছিলো- ‘সালামের প্রসার ঘটাও’। যাকে দেখবে, তাকে সালাম দিতে হবে।

একবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, “ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম?”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন:

“তুমি লোকদেরকে খাদ্য খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দিবে।” [সহীহ বুখারী: ২৮]

আপনি কী পোশাক পরে আছেন সেটার ওপর নির্ভর করছে না আপনার ইসলাম শ্রেষ্ঠ কিনা। আপনার ইসলাম পালন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, সর্বোত্তমভাবে হচ্ছে কিনা সেটা নির্ভর করছে আপনি মানুষকে খাওয়াচ্ছেন কিনা, মানুষকে সালাম দিচ্ছেন কিনা।

আমরা সাধারণত চেনা-পরিচিত মানুষদেরকে সালাম দিই। অচেনাদের সালাম দিই না। এটা ঠিক না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দেন- চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দিতে হবে। আমি যদি বুঝতে পারি আরেকজন মুসলিম, তাহলে তাকে সালাম দেবো; তাকে না চিনলেও সালাম দেবো।

মুসলিমের ওপর মুসলিমের হক ছয়টি। তারমধ্যে একটি হক হলো:

কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেয়া। [সহীহ মুসলিম: ৫৫৪৪]

কেউ যদি আপনাকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে, তাহলে আপনার ওপর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের হক পাঁচটি। তারমধ্যে একটি হলো:

সালামের জবাব দেয়া। [সহীহ বুখারী: ১২৪০]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে, তখন তোমরা তারচেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই বলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাব গ্রহণকারী।” [সূরা আন-নিসা ৪: ৮৬]
কেউ যদি আপনাকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে, আপনি জবাবে বলুন ‘ওয়ালাইকুমুস সালাম’। অথবা, ‘ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বা ‘ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাহাতুহ’।
আপনি যেভাবে সালাম দিবেন, তার ওপর আপনার সওয়াব নির্ভর করবে।
‘আসসালামু আলাইকুম’ বললে ১০ নেকি
‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বললে ২০ নেকি
‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ’ বললে ৩০ নেকি পাবেন। [জামে আত-তিরমিজি: ২৬৮৯]
আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ বললেন,
“তুমি ফেরেশতাদেরকে সালাম দাও এবং তারা সালামের জবাবে কী বলে সেটা মনোযোগের সাথে শুনবে। কারণ, এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ।” [সহীহ বুখারী: ৬২২৭]
এজন্য আমরা দেখতে পাই, ইব্রাহিমী ধর্মের অনুসারীদের সম্ভাষণ হলো সালাম। ইহুদিরা বলে ‘সালমালিকুন’। খ্রিস্টানরাও একই কথা বলতো।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
“ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো না, কী করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো- তোমরা পরস্পর বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে।” [সহীহ মুসলিম: ৯৮]
এই হাদীসটি শুরু হয়েছে কী করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে এই নিয়ে। শেষ হয়েছে সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়ে। অর্থাৎ, জান্নাতে যাবার একটি সহজ রাস্তা হলো সালাম দেয়া।
আমি যখন কাউকে সালাম দিই, এর মানে কী দাঁড়ায়?
‘আস-সালাম’ হলো আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। আমি যখন কাউকে সালাম বলি, তারমানে আমি তার জন্য দু’আ করি- আল্লাহ তোমাকে শান্তিতে রাখুন, নিরাপদ রাখুন, তোমার কল্যাণ করুন।
আমি সালাম করা মানে তার জন্য দু’আ করি। সালাম মানে যেমন শান্তি, তেমনি এর আরেকটি অর্থ হলো ক্ষতি মুক্ত। আমি তাকে জানাচ্ছি- তোমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, তোমার ওপর যেন কোনো বিপদ না আসে, তোমার দুশ্চিন্তা যেন কমে যায়।
আমি যখন অন্যের বিপদমুক্ত, কষ্টমুক্ত, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার প্রার্থনা করছি, তখন এমনিতেই তাকে জানিয়ে দিচ্ছি- অন্তত আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। তুমি আমার দিক থেকে নিরাপদ। আমি একজনকে বললাম, ‘তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’; এটা বলার পর আমি কিভাবে তার জীবনে অশান্তির কারণ হতে পারি? আমি তার পাওনা টাকা দিচ্ছি না, তার নামে গীবত করছি, তার দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাকে শারীরিক-মানসিক আঘাত করছি। এমনটা করলে তো বুঝা গেলো, আমি বলছি এক, আর করছি আরেক!

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায় সময় বাজারে যেত্ন, কিন্তু তেমন কিছু কিনতেন না। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি কিছু কিনেন না, তারপরও বাজারে যান কেনো? তিনি জবাবে বলতেন, “যাতে আমি আমার ভাইদেরকে সালাম দিতে পারি।”

সালাম দেয়া এমন একটু গুণ, আমরা যে কেউ তা অর্জন করতে পারি। এটা খুবই সহজ। আমরা অপেক্ষায় থাকবো না কেউ আমাদেরকে সালাম দিচ্ছে কী না। কেউ সালাম দেবার আগেই আমরাই তাকে সালাম দেবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় আগে সালাম দিতেন। এমনকি শিশুদেরকেও তিনি সালাম দিতেন।

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মদীনায় একদল শিশু খেলা করছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তাদেরকে সালাম দেন। [সহীহ বুখারী: ৬৩৪৭]

আল্লাহ হলেন ‘আস-সালাম’। তিনি আমাদেরকে দান করবেন ‘দারুস সালাম’ (জান্নাতের একটি নাম হলো দারুস সালাম; কারণ সেখানো কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই)। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চান আমরা যেন সালাম দিই।

তারমানে, আমরা যদি সালাম দিই, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলি, তাহলে ‘আস-সালাম’ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দারুস সালাম দান করবেন।

জান্নাতে প্রবেশের পর ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে সালামের মাধ্যমে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

“আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো।” [সূরা আয-যুমার ৩৯: ৭৩]

মুনাফিক

মুনাফিক (আরবিতে: مـنافق, বহুবচন মুনাফিকুন) একটি ইসলামি পরিভাষা যার অর্থ একজন প্রতারক বা "ভন্ড ধার্মিক" ব্যক্তি। যে প্রকাশ্যে ইসলাম চর্চা করে; কিন্তু গোপনে অন্তরে কুফরী বা ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস লালন করে। আর এ ধরনের প্রতারণাকে বলা হয় নিফাক (আরবি: نفاق)।

প্রকারভেদ

সালিহ আল মুনাজ্জিদের মতে, কুফরের মতও নিফাক দুই প্রকার, যার একটি বড় যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়, আরেকটি ছোট যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, যথাঃ

আক্বীদাগত মুনাফেকি বা বিশ্বাসগত নিফাক: বাইরে ইসলামী আকীদা কিন্তু ভেতরে অনৈসলামিক আকীদা পোষণ করা। এটি বড় কুফর যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। তা ছয় প্রকার: রাসূলকে (মুহাম্মাদ) মিথ্যা সাব্যস্ত করা, অথবা রাসূল যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তার কোনো কিছুকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, কিংবা রাসূলকে ঘৃণা করা, অথবা রাসূল যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তাকে ঘৃণা করা, রাসূলের ধর্মের ক্ষতিতে খুশি হওয়া অথবা রাসূলের ধর্মের বিজয় অপছন্দ করা।

আমলগত মুনাফেকি বা কর্মগত নিফাক: তা হলো ছোট কুফর যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে না। তবে তা বড় ধরনের অপরাধ ও মহাপাপ। তন্মধ্যে রয়েছে সে আমল যা নবি মুহাম্মাদ হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ মুনাজ্জিদ মুনাফেকীকে আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করেছেন, তা হলো, মৌলিক ও অমৌলিক মুনাফিকী এ বিষয়ে তিনি বলেন, "যে লোক আদি থেকেই কোনদিন ছহীহ-শুদ্ধ, খাঁটি ইসলামে বিশ্বাসী নয়। মূলতঃ সেই মূল থেকে মুনাফিক। জাগতিক কোন স্বার্থের টানে এমন লোকেরা ইসলামের সঙ্গে সম্বন্ধ যাহির করে বটে, অথচ তারা মন থেকে ইসলামকে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা তাদের ইসলাম ঘোষণার প্রথম দিন থেকেই মুনাফিক। তারপর সেই মুনাফিকীর উপর তারা চলছেই। এটা মৌলিক মুনাফিকী। আবার কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারভাবেই অন্তর থেকে ইসলামের ঘোষণা দেয়। তারপর তাদের মনে সন্দেহ ও শঠতা ভর করে। অতঃপর বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের সত্যতার পরীক্ষা নেন। তখন তারা ইসলামের দাবী রক্ষা করতে না পেরে ভেতর থেকে ইসলাম ছেড়ে দেয় বা মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলে তাদের উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হতে পারে কিংবা মুসলিম নাম বহাল থাকায় জাগতিক যেসব সুযোগ-সুবিধা সে পাচ্ছে তা খোয়াতে হবে অথবা তাকে নিন্দা শুনতে হবে এবং সমাজে তার যে অবস্থান আছে তা তাকে হারাতে হবে, এরকম আরো অনেক উপভোগ্য ও লোভনীয় বিষয়ের কথা চিন্তা করে তারা প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে ভয় পায়। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কাফির মুরতাদ হয়ে গেছে। এটাই অমৌলিক মুনাফিকী।"[১]

আবার কারও মতে, নিফাকের ধরন তিনটি

প্রকৃত ঈমান সম্পর্কে আল্লাহর প্রতি নিফাক।

ঈমানের নীতিগুলির প্রতি নিফাক: উদাহরণস্বরূপ, কেউ আল্লাহ, বিচার দিবস, হিসাব, কাজের মাপকাঠি এবং জাহান্নাম (একটি অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহের সাথে) বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু তাদের ভয় না করে (বাস্তবে) বা পাপ করা থেকে বিরত থাকে না সেগুলোর কারণে। তবুও তিনি দাবি করেন, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

অন্যের প্রতি নিফাক: দুমুখো ব্যক্তি। যে কারও উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করে, তারপর, তার পিছনে, তার নিন্দা করে এবং তাকে কষ্ট দিতে ও তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে

মুনাফিকদের অবস্থান (موقف المنافقين)

তাবূক যুদ্ধে মুনাফিকদের অবস্থান ছিল খুবই জঘন্য। যাতে মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে বের না হয় এবং রোমকদের হামলার পথ সুগম হয়, সেজন্য তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেকারণ তাদের ও দুর্বল ঈমানদারদের লক্ষ্য করে সূরা তওবা ৩৮ থেকে ১১০ পর্যন্ত পরপর ৭২টি আয়াত নাযিল হয়। তাতে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও মুনাফিকদের বিষয়ে তারা অধিক সজাগ হয়।

মুনাফিকরা নিজেরা তো দান করেনি। উপরন্তু এই দানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল (তওবা ৯/৭৯)। তাদের ঠাট্টা যেন এরূপ ছিল যে, বিশ্বশক্তি রোমক বাহিনীকে এরা দু'চারটি খেজুর দিয়ে পরাস্ত করতে চায়। কিংবা দু'চারটা খেজুর দিয়েই এরা রোম সাম্রাজ্য জয়ের দিবা স্বপ্ন দেখছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে মুনাফিকরা নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকে। উপরন্তু তারা গোপনে মুমিনদের বলতে থাকে যে, মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা কেউ আর মদীনায় ফিরতে পারবেনা। রোম সম্রাট ওদের বন্দী করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিবেন। তারা বলে, لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ 'তোমরা এই গরমে বের হয়োনা' (তওবা ৯/৮১)। তাদের প্ররোচনায় কেউ কেউ গিয়ে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে' (তওবা ৯/৪৩)। এ সময় মদীনার বেদুঈনদের মুনাফেকী ও অবাধ্যতা ছিল খুবই বেশী' (তওবা ৯/৯৭)।[1] মদীনার শহর এলাকা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বস্তী এলাকাতেও মুনাফেকী ছড়িয়ে পড়ে। যাদেরকে রাসূল (ছাঃ) জানতেন না। কিন্তু আল্লাহ জানতেন' (তওবা ৯/১০১)। আল্লাহ পাক এসব মুনাফিকদের ওযর কবুল করতে এবং তাদের কথা বিশ্বাস করতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিষেধ করেন' (তওবা ৯/৯৪)। এমনকি কুরআন তাদেরকে 'অপবিত্র' (رِجْسٌ) বলে আখ্যায়িত করে' (তওবা ৯/৯৫)।

এভাবে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে আমলে ও আচরণে বিভক্তি রেখা সৃষ্টি হয়। ক্বোবায় মুনাফিকদের তৈরী 'মসজিদে যেরারে' রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায়ে নিষেধ করা হয়' (তওবা ৯/১০৭-০৮)। তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর জানাযায় শরীক হওয়ার পর থেকে সকল মুনাফিকের জানাযায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়' (তওবা ৯/৮৪)। তাবূক যুদ্ধে মুনাফিকদের বৃহদাংশ যোগদান করেনি। দু'চার জন যারা গিয়েছিল, তারা গিয়েছিল স্রেফ ষড়যন্ত্র করার জন্য। এমনকি ফেরার পথে তাদের মধ্যে ১২ জন রাসূল (ছাঃ)-কে এক পাহাড়ী সরু পথে হত্যার চেষ্টা করে (আল-বিদায়াহ ৫/১৯)।

তাছাড়া ঐ সময় ছিল ফল পাকার মৌসুম। যে কারণে মদীনা থেকে বের হওয়া তখন ছিল বড়ই কষ্টকর বিষয়।

মদীনার এই সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيم 'হে মুমিনগণ! মুশরিকগণ (শিরকী আক্বীদার কারণে) নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। (ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের হাতে থাকার কারণে) তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে সত্বর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (তওবা ৯/২৮)। যারা অজুহাত দিয়ে পিছিয়ে থাকার অনুমতি চেয়েছিল, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون 'যদি গণীমত নিকটবর্তী হ'ত এবং সফর কাছাকাছি হ'ত, তাহ'লে ওরা অবশ্যই তোমার অনুগামী হ'ত। কিন্তু তাদের নিকট (শাম পর্যন্ত) সফরটাই দীর্ঘ মনে হয়েছে। তাই সত্বর ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, সাধ্যে কুলালে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হ'তাম। এভাবে (শপথ করে) তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ জানেন যে ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' (তওবা ৯/৪২)। অতঃপর দৃঢ় বিশ্বাসী মুমিনদের প্রতি আহবান জানিয়ে আল্লাহ বলেন, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون 'তোমরা বেরিয়ে পড় অল্প সংখ্যায় হও বা অধিক সংখ্যায় হও এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে' (তওবা ৯/৪১)। আল্লাহর এই আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমানদারগণ দলে দলে জিহাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চারপাশে জমা হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেন, আয়াতগুলি সবই তাবূক যুদ্ধের ঘটনায় নাযিল হয়েছিল' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৫২৮)।

[1]. প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু সালামাহ গোত্রের জাদ বিন ক্বায়েসকে রাসূল (ছাঃ) জিহাদে যাওয়ার আহবান জানালে সে বলল, রোমক নারীরা খুবই সুন্দর। ওদের দেখে আমি ফিৎনায় পড়ে যাওয়ার আশংকা করি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। এ কথা শুনে

রাসূল (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ বিষয়ে তওবা ৪৯ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِّي ‘আর তাদের মধ্যেকার কেউ বলে, আমাকে (যুদ্ধ থেকে) অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না’ (তওবা ৯/৪৯; যাদুল মা‘আদ ৩/৪৬১)। বর্ণনাটি যঈফ (মা শা-‘আ ২১৩-১৭ পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি একাই মাত্র হোদায়বিয়াতে বায়‘আতুর রিযওয়ানে অংশ নেয়নি।

মুনাফিকদের সাথে মুসলিমদের করনীয়

সালিহ আল মুনাজ্জিদ কুরআন ও সহিহ হাদীস অনুযায়ী মুনাফিকদের সাথে মুসলিমদেরকে নিম্নলিখিত আচরণ করতে বলেছেন,

মুনাফিকদের আনুগত্য না করা

মুনাফিকদের উপেক্ষা করা, ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দান

মুনাফিকদের সঙ্গে বিতর্কে না জড়ানো এবং তাদের পক্ষাবলম্বন না করা

মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে না তোলাই

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালনা এবং কঠোরতা আরোপ

মুনাফিকদের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো এবং তাদের নেতা না বানানো

মুনাফিকদের জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ না করা

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য

- আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ৮ থেকে ২০ পর্যন্ত মোট ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নাজিল করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সুরায় আরও ৩৮টি আয়াতে মুনাফিকদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মুনাফিকের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো—

- তারা দুমুখো স্বভাবের হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তারা মুমিনদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে—আমরা ইমান এনেছি, আবার যখন নিরিবিলি তাদের শয়তানদের (কাফির নেতাদের সঙ্গে) মিলিত হয়, তখন বলে—আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি।' (সুরা বাকারা: ১৪)
- তারা খুবই ধূর্ত ও প্রতারক হয়। তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে প্রতারণা করে। তারা এই কাজকে সফলতা ও বিজয় মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ ও ইমানদারদের তারা ধোঁকা দিতে চায়, আসলে তারা অন্য কাউকে ধোঁকা দিচ্ছে না, বরং নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তাদের সেই অনুভূতি নেই।' (সুরা বাকারা: ৯)
- তাদের বিশ্বাসে সন্দেহ, অস্বীকৃতি ও মিথ্যা থাকার কারণে তাদের অন্তরকে অসুস্থ অন্তর বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। এরপর আল্লাহ সেই ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মিথ্যাচারের কারণে। তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সুরা বাকারা: ১০)
- তারা ইসলাম ও সামাজিক স্থিতিশীলতার বিরোধিতা করে এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে তা অনুভব করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সাবধান! এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাদের সেই অনুভূতি নেই।' (সুরা বাকারা: ১২)
- তারা নিজেদের বুদ্ধিমান ও চালাক মনে করে। আর মুমিন ও নেককারদের নির্বোধ ও বোকা বলে মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তাদের বলা হয়—অন্য লোকজনের মতো তোমরাও ইমান আনো, তখন তারা বলে—আমরা কি সেই নির্বোধদের মতো ইমান আনব? আসলে তারাই নির্বোধ, কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান নেই।' (সুরা বাকারা: ১৩)
- তারা মিথ্যুক। তারা আল্লাহ ও রাসুল সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' (সুরা মুনাফিকুন: ১)
- তারা অহংকারী ও দাম্ভিক। আল্লাহ বলেন, 'আপনি তাদের দেখবেন যে তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (সুরা মুনাফিকুন: ৬)

মুনাফিকদের পরিণাম

মুনাফিকদের পরিণাম ভয়াবহ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করবে।' (সুরা নিসা: ১৪৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ওয়াদা করেছেন—মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে দোজখের আগুন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আজাব।' (সুরা মুনাফিকুন: ৬৮)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মুনাফিক মহানবী (সা.)-এর যুগে যেমন ছিল, আজকের দিনেও আছে, আর সেটা হলো ইমান প্রকাশ করে আল্লাহর দীনের বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া। (বুখারি)

জাহিলিয়্যাতের যুগ ও মিথ্যা

মুনাফিকদের নিদর্শন এর মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শন হলো, মিথ্যা কথা বলা । মিথ্যা কথা বলা এমন হারাম যে , কোন সম্প্রদায় বা কোন জাতি নিকটে এটা বৈধ

নয় । এমনকি জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা ও মিথ্যা কথা বলা কে খারাপ মনে করত । যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বাদশার নিকট ইসলামের দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করলেন,তখন রোমের বাদশা চিঠি পড়ার পর দরবাস্ত লোকদের বলল : যদি আমাদের রাষ্ট্রে এমন কোন লোক থাকে যে তার (মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে অবগত আছে, তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। যেন আমি তার নিকট ওই ব্যক্তির (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জানতে পারি তিনি কেমন ব্যক্তি। ঘটনা ক্রমে তখন আবু সুফিয়ান (যিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) একটি ব্যবসায় কাফেলা নিয়ে রোমে পৌঁছে ছিলেন। লোকেরা তাকে বাদশার দরবারে নিয়ে গেলেন । দরবারে পৌছার পর পরে বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করা আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রশ্ন: ঐ ব্যক্তি(মহানবী সাঃ) কোন গোত্রের এবং এটা কিরুপ? আরবে এর প্রসিদ্ধ কেমন ? উত্তরে আবু সুফিয়ান বললেন, বংশ তো খুবই সম্ভ্রান্ত । সম্ভ্রান্ত বংশেই তার জন্ম।সমগ্র আরব বাসি এই বংশের সম্ভ্রান্ত স্বীকার করে । বাদশাহ তার উত্তর কে সমর্থন জানিয়ে বলল তুমি সঠিক বলছো , যারা আল্লাহর নবী তারা শ্রেষ্ঠ বংশের জন্মগ্রহণ করে থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন : বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন তার অনুসারীগণ কি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ নাকি সমাজের উচ্চ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ? তিনি বলেন তার অনুসারীগণ সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ । বাদশা সত্যায়ন করে বললেন : হ্যা নবীদের প্রাথমিক অনুসারীগণ দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হয় । তারপর বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, যখন তোমাদের মাঝে যুদ্ধ হয়, কে বিজয় লাভ করে তোমরা নাকি তিনি,

তখন পর্যন্ত মুসলমান ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে দুইটা যুদ্ধ হয়, বদর ওহুদ যুদ্ধ,যদিও ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা বিপর্যয় হয়,,সে বল্ল কখনো আমরা আবার কখনো তারা বিজয় হয়।

মুজাহাদা:মুমিন জীবনের দিশারি

মুজাহাদা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল : চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম।

পরিভাষায় মুজাহাদা বলা হয় : দীনে ইসলামের আনুগত্য, অনুসরণ, প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করা।

মুজাহাদা ও জিহাদ একই শব্দ হলেও পরিভাষায় মুজাহাদার অর্থ ব্যাপক। জিহাদ বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে।

মুজাহাদা বা চেষ্টা, সংগ্রাম, সাধনা করতে যেয়ে যদি প্রতিপক্ষের মুকাবেলা করতে হয়, তখন আমরা বলি জিহাদ।

তাই সব জিহাদই মুজাহাদা বলে পরিগণিত হয়, কিন্তু সব মুজাহাদা জিহাদ অর্থ বহন করে না।

মুজাহাদা বিষায়ক কুরআনের আয়াত

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন

,
َوَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।' (সূরা আল আনকাবুত: ৬৯)

আল্লাহ রাববুল আলামীন আরো বলেন :

'আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর।' (সূরা আল হিজর: ৯৯)

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন :

'আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।' (সূরা আল মুযযাম্মিল: ৮)

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন :

'অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল: ৭)

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন :

'আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আল মুযযাম্মিল: ২০)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

'আর তোমরা কল্যাণকর যা কিছু ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।' (সূরা বাকারা : ২৭৩)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা যা শিখতে পারিঃ

১- যে আল্লাহর দীনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে আল্লাহ তাকে অনেক পথ খুলে দেবেন।

২- আল্লাহর দীন অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করতে হবে।

৩- মুজাহাদা শব্দের অর্থ হল: কোনো বিষয় অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা, সংগ্রাম করা।

৪- যারা আন্তরিকভাবে, ইখলাসের সাথে আল্লাহর দীনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তারা হল মুহসিন। আর আল্লাহর রহমত ও সাহায্য মুহসিনদের সাথেই আছে।

৫- আললাহর দীনের পথে চেষ্টা চালাতে হবে বিরামহীনভাবে। জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কখনো বিরতি নেই। বিরাম নেই। নেই কোনো বিশ্রাম ।

৬- দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াকীন শব্দের অর্থ হল মৃত্যু। এটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াকীন শব্দের আভিধানিক অর্থ হল দৃঢ়-বিশ্বাস।

৭- আল্লাহর স্মরণের সাথে সাথে একাগ্রচিত্তে তার পথে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৮- কেহ অনু পরিমাণ ভাল কাজ করলেও তা বৃথা যাবে না। তাই বিরামহীনভাবে ভাল কাজ করে যেতে হবে।

৯- যত টুকু ভাল কাজ করা হবে সবই আল্লাহ তাআলার কাছে জমা থাকবে। তিনি এর যথাযথ বরং অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিদান দেবেন। তাই কোনো সময় নষ্ট করা যাবে না।

১০- ইস্তেগফার বা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১- আল্লাহর দীনের পথে সম্পদ ব্যয় করার ফজিলত প্রমাণিত হল। তিনি তার পথে, তার দীনের জন্য ব্যয় করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

হাদীস -১.

1-عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه. قال قال رسول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ تعالى قال: منْ عادى لي وليًّاً. فقدْ آذنتهُ بالْحرْب. وما تقرَّبَ إِلَيَ عبْدِي بِشْيٍءٍ أَحبَّ إِلَيَ مِمَّا افْتَرَضْت عليْهِ: وما يَزالُ عبدي يتقرَّبُ إِلى بالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُه كُنْتُ سمعهُ الَّذي يسْمعُ به، وبَصره الذي يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ التي يَبْطِش بِهَا، ورِجلَهُ التي يمْشِي بها، وَإِنْ سأَلنِي أَعْطيْته، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَّنه» رواه البخاري.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেই। আমার বান্দা ফরজ ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা প্রতি নিয়ত: আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে আমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই। আর আমি যখন তাকে আমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোনো কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। (বর্ণনায়, সহিহ বুখারি)

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

১- আল্লাহর ওলীদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তারা হলেন আল্লাহর ওলী বা বন্ধু। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

'শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয় নেই, আর তারা পেরেশান হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।' (সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)

এ আয়াতে আল্লাহর ওলীদের দুটো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হল ঈমান, আর দ্বিতীয় হল জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ-কে ভয় করে চলা, আল্লাহর হুকুম আহকামের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে পথ চলা। এক কথায় তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা।

২- যারা আল্লাহর এমন সব ওলীদের সাথে আল্লাহর ওলী হওয়ার গুণাবলি বহন করার কারণে শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।

৩- ফরজ ইবাদতসমূহের গুরুত্ব বুঝা গেল।

৪- ফরজ ইবাদত আদায়ের পর যত বেশি সম্ভব নফল আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চেষ্টা করা।
৫- যথাযথ ঈমান আনা ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা, ফরজগুলো আদায় করা, ফরজ ছাড়া যত ইবাদত আছে তা আদায় করলে এমন মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় যে, তার কান, চোখ, হাত, পা ইত্যাদি এক কথায় সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহর রহমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। সে আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তা-ই দান করেন।
হাদীস -২.
-2عن أَنس رضي الله عنه عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فيمَا يرْوِيهِ عنْ ربهِ عزَّ وجَلَّ قال: «إِذَا تقرب الْعبْدُ إِليَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِراعاً، وإِذَا تقرَّب إِلَيَّ ذراعاً تقرَّبْتُ منه باعاً، وإِذا أَتانِي يَمْشِي أَتيْتُهُ هرْوَلَة» رواه البخاري.
আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তখন তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এ কায়া পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যখন আমার দিকে হেটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'
(বর্ণনায় : বুখারী)
হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েলঃ
১- এ হাদীসটি হাদীসে কুদসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল কথা আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।
২- আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হল, তার আদেশ নির্দেশগুলো মেনে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করা। এ চেষ্টা সাধনায় যে যত বেশি এগিয়ে যাবে, আল্লাহর রহমত তার দিকে আনুপাতিক হারে ততবেশী এগিয়ে আসবে।
৩- এ হাদীসে আল্লাহ তাআলার পথে বেশি করে মুজাহাদা তথা চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে ও এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।
হাদীস -৩.
-3عن ابن عباس رضي اللهُ عنه قال: قال رسول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «نِعْمتانِ مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» رواه مسلم.
ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'দুটি নেয়ামত এমন যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। আর তা হল: সুস্থতা (সুস্বাস্থ্য) ও অবসর সময়।' (বর্ণনায়: বুখারী)
হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েলঃ
১- মানুষ যে সকল নেয়ামত বা দান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনায়াসে লাভ করে থাকে তার মধ্যে দুটো হল: সুস্থতা ও অবসর সময়।

২- কিন্তু মানুষ এ দুটো দান বা নেয়ামাত-কে কাজে লাগানোর ব্যাপারেই বেশি উদাসীন, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তারা যেমন সুস্থতা-কে পুরোপুরি কাজে লাগায় না, তেমনি সময়টাকেও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে না।

৩- এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থতা ও সময়কে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে উপদেশ দিয়েছেন। যে যত বেশি সুস্থতা ও সময়কে কাজে লাগাতে পারবে সে তত কম ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪- যে যত বেশি সময়-কে অযথা ব্যয় করবে ও সুস্থাবস্থায় খারাপ কাজ করবে, সে তত বেশি ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৫- এ হাদীস সুস্থতা ও সময়-কে মুল্যায়ন করতে শিক্ষা দিয়েছে। সময় থাকতেই সময়কে কাজে লাগাতে হবে। সুযোগ থাকতেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

হাদীসে এসেছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: المنذري المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 203/4خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما[

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওয়াজ করার সময় বলেছেন: তুমি পাঁচটি অবস্থা আসার পূর্বে পাঁচটি বিষয়-কে গণীমত (সুবর্ণ সুযোগ) মনে করবে। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন-কে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা-কে, ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসর-কে, দারিদ্র আসার পূর্বে সচ্ছলতা-কে আর মৃত্যু আসার পূর্বে জীবন-কে।'

(বর্ণনায় : আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব)

৬- সময় ও সুযোগ-কে পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর পথে তার নির্দেশ অনুযায়ী সময় ও শ্রম ব্যয় করে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

হাদীস -8.

-4عن عائشة رضي اللهُ عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَان يقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حتَّى تتَفطَرَ قَدمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ، لِمْ تصنعُ هذا يا رسولَ اللهِ وقدْ غفَرَ اللهُ لَكَ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وما تأَخَّرَ؟ قال: «أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عبْداً شكُوراً؟» متفقٌ عليه.

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এত দীর্ঘ সময় নামাজে দাড়িয়ে থাকতেন যে তার পা দুটো ফুলে যেত। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ রকম করছেন কেন, যখন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের ও পরের পাপগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'আমি কি পছন্দ করবো না যে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাই?'

(বর্ণনায়: বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস থেকে শিক্ষা ও মাসায়েলঃ

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন। এতে দীর্ঘ সময় ধরে কোরআন তেলাওয়াত করেছেন।

২- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন। তার কোনো পাপ ছিল না।

৩- মহান আল্লাহ রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে অর্পিত সকল প্রকার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার পরও তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি মনে করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাকে আরো কিছু করতে হবে। আমি যা কিছু করেছি তা তো তার তাওফিকে করতে পেরেছি। তার ইচ্ছায়, তার দেয়া সামর্থে করেছি। আমার কৃতিত্ব এখানে কি আছে? কাজেই তার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হলে আমার ঘুমিয়ে থাকা চলবে না। কাজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য ত্যাগ ও কোরবানি করতে হবে।

৪- সকলেরই এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু করছি তার নৈকট্য অর্জনের জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয়। আরো অনেক বেশি করা উচিত।

৫- আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য, তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার জন্য মুজাহাদা ও সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর গুরুত্ব শিক্ষা দিচ্ছে আমাদেরকে রাসূলের এ হাদীসটি।

মুমিনের প্রতিদিনের আমল

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ঘুম থেকে জেগে উঠে দু'আ পড়ুন।

পেশাব-পায়খানার দরকার হলে সারুন।

দাঁতন করুন।

গোসলের দরকার হলে গোসল নতুবা ওযূ করুন।

তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায পড়ুন।

তাহাজ্জুদ পড়ুন।

আযান শুনে আযানের জবাব দিন।

আযানের পর ফজরের সুন্নাত পড়ুন।

ফজরের পর ডানকাতে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিন। তবে অবশ্যই ঘুমিয়ে যাবেন না।

আযান হলে জামাআতে নামায পড়তে মসজিদে যান।

মসজিদে যাওয়া ও সেখানে অবস্থান করার নানান আদব খেয়াল রাখুন।

ফরয নামাযের ইকামত হলে সুন্নাত ত্যাগ করে ফরয নামায পড়ুন।

নামাযের পর যথানিয়মে জিকির পড়ুন।

ফজরের নামায পড়ে সূর্য ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে তিলাওয়াত ও জিকির করুন। তার সওয়াব অনেক। ইল্মী মজলিস থাকলে সেখানে বসুন।

সকালের জিকির-আযকার পড়ুন।

প্রকাশ থাকে যে, সকালে ৭০ হাজার ফিরিশ্তার দু‘আ এবং ঐ দিনে মরলে শহীদের দর্জা পাওয়ার জন্য সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করার হাদীস সহীহ নয়। (যয়ীফ তারগীব হা/৩৭৯, যয়ীফুল জামে’ হা/৫৭৩২)

ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত (ফজরের ছুটে যাওয়া সুন্নাত বা কারণ-ঘটিত কোন নামায ছাড়া) সাধারণ কোন নফল নামায পড়া যাবে না। যেমন সূর্য ওঠা, ডোবা ও ঠিক মাথার উপর থাকার সময় নফল নামায নিষিদ্ধ।

প্রয়োজনে ফজরের পর ঘুমাতে পারেন। তবে উদাসীন ও অলসদের মত খামাখা বিলাস-নিদ্রায় পড়ে থাকা উচিত নয়। বরং কাজ থাকলে সকাল-সকালই সেরে ফেলা কর্তব্য। অবশ্য ‘‘সকালের ঘুম রুযী থেকে বঞ্চিত করে।’’ এ হাদীস সহীহ নয়। (যয়ীফুল জামে’হা/৩৫৩১) যেমন ‘‘সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে মানুষের রুযী বন্টন করা হয়’’ এ মর্মে নবী-দুলালী ফাতিমার হাদীসটি মউযূ’ বা জাল। (যয়ীফ তারগীব হা/১০৪৭)

সূর্য ওঠার পর ইশরাক্বের নামায পড়ুন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর জিকির করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।’’ বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, ‘‘পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।’’ অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব।[1]

তিনি আরো বলেছেন, ‘‘ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকিরকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।’’[2]

নাশ্তার সময় খাওয়ার আদব মনে রাখুন।

পোশাক পরার সময় তার পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার আদব মনে রাখুন।

ঘর থেকে বের হওয়ার আদব এবং সফর, সাক্ষাৎ, যিয়ারত ও যিয়াফতের আদব খেয়াল রাখুন।

যে কাজেই যান ইসলামের বিধান ভুলে যাবেন না।

ঘরে থাকলে চাশ্তের সময় চাশ্তের নামায পড়ুন।

যাওয়ালের পূর্বে যাওয়ালের নামায পড়ুন। যাওয়ালের পরেও ৪ রাকআত পড়ুন।

যোহরের সময় যোহরের নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করুন।

দুপুরের খাবারের সময় খাবারের আদব খেয়াল করুন।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিন। যেহেতু রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘তোমরা দুপুরের সময় বিশ্রাম নাও। শয়তানরা এ সময় বিশ্রাম নেয় না।’’[3]

এই বিশ্রাম ও বিরতির ফলে দেহ-মন তরতাজা হয়ে উঠবে। নতুনভাবে কাজ ও ইবাদতে মন বসবে। রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সহজ হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সামান্য দিবানিদ্রা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

আসরের সময় আসরের নামায মসজিদে গিয়ে পড়ুন।

আসরের আগে ৪ রাকআত সুন্নাত পড়ুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করবেন।

আসরের ফরয নামাযের পর (কারণ-ঘটিত কোন নামায ছাড়া) আর কোন নফল নামায নেই।

আসরের নামাযের পর বসে তিলাওয়াত ও জিকির করুন। ইল্মী মজলিসে বসুন।

আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকিরকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।’’

আসরের পর কস্নান্ত থাকলে অথবা বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হলে আপনি ঘুমাতে পারেন। এ সময় ঘুম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অথবা ঘুমালে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতে পারে বলে যে হাদীস বর্ণনা করা হয় তা সহীহ নয়।

মাগরেবের নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করুন।

ইচ্ছা হলে ও সময় থাকলে মাগরেবের ফরযের আগে ২ রাকআত নামায পড়ুন। সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে পড়ার চেষ্টা করুন। মাগরেবের সুন্নতের পর আর নির্দিষ্ট কোন নফল নামায নেই।

এশার আযান হলে জামাআতে এশার নামায পড়ুন। সুন্নাত পড়ে বাড়ি ফিরে রাতের খানা খেয়ে বেশী রাত না জেগে যথাসম্ভব আগে আগে ঘুমিয়ে যান। যাতে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠতে আপনার কষ্ট না হয়। আর কোন বৈধ কারণবশতঃ রাত হয়েই গেলে ওযূ করে ২/৪ রাকআত নামায পড়ে বিত্র পড়ে শুয়ে যান। পক্ষান্তরে রাতে উঠতে পারবেন না -এই আশঙ্কা হলে এশার সুন্নতের পরে বিত্র পড়ে নিন।

আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এশার আগে ঘুমাতে এবং পরে (অপ্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।[4]

প্রকাশ থাকে যে, এশার নামাযের পর বাড়ি ফিরে ৪ অথবা ৬ রাকআত নামায পড়ার হাদীস সহীহ নয়।

কোন কর্মে দ্বিধাগ্রস্ত হলে নিজ রবের কাছে পরামর্শ নিন এবং তার জন্য ইস্তিখারার নামায পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।

কঠিন বিপদে বা সমস্যায় পড়লে অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার দরকার হলে স্বালাতুল হা-জাহ পড়ে আল্লাহর কাছে আবেদন জানান।

কোন পাপ করে ফেললে আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের জন্য স্বালাতুত তাওবাহ পড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান।

চন্দ্রে অথবা সূর্যে গ্রহণ লাগলে যথানিয়মে জামাআত সহকারে তার নামায পড়ুন।

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে যথানিয়মে জামাআত সহকারে স্বালাতুল ইস্তিস্কা পড়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন।

জুমআর দিন বেশী বেশী দরূদ পড়ুন, সূরা কাহফ পড়ুন। সকাল সকাল গোসল করে মসজিদে উপস্থিত হন। নিয়মিতভাবে জুমআর নামায আদায় করুন। এই দিনে দু‘আ কবুল হওয়ার সময়

খুঁজতে আল্লাহর ইবাদতে ও দু'আয় মশগুল থাকুন। অবশ্য রুযী সন্ধানের প্রয়োজন থাকলে কাজে বেরিয়ে যান।

প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখুন।

প্রত্যেক হিজরী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ এই তিনদিন রোযা রাখুন।

যেহেতু আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।’’[5]

আবূ যার্র (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা রাখবে, তার সারা বছর রোযা রাখা হবে। আল্লাহ আযযা অজাল্লা এর সত্যায়ন অবতীর্ণ করে বলেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

কেউ কোন ভাল কাজ করলে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে।[6] এক দিন ১০ দিনের সমান।’’[7]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘‘ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্‌কা দূর করে দেয়।’’[8]

মুহার্রাম মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রাখার চেষ্টা করুন। বিশেষ করে ৯ ও ১০ তারীখে আশূরার রোযা রেখে এক বছরের পাপ মাফ করিয়ে নিন।

শা'বান মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রাখার চেষ্টা করুন। রমযানের মাসের রোযা রাখার সাথে সাথে নিয়মিত তারাবীহ পড়ুন। বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি শবেকদরের রাত্রির খোঁজে শেষ দশকের সমস্ত বেজোড় রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করার চেষ্টা করুন। রমযানের পর শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখুন। আপনার সারা বছর রোযা রাখা হবে।

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন যুল-হজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সর্বপ্রকার নেক আমল করার চেষ্টা করুন। এই নয় দিনে রোযা রাখুন। বিশেষ করে এ মাসের ৯ তারীখে আরাফার রোযা রেখে গত ও আগামী এক বছরের (সর্বমোট দুই বছরের) গোনাহ মাফ করিয়ে নিন। ১০ তারীখে সাধ্যমত কুরবানী করুন। ঈদের নামায পড়ে খুশী হন, অপরকে খুশী করুন।

খুব বেশী শক্তি থাকলে একদিন পর একদিন দাঊদী রোযা রাখুন। যৌন-পীড়ায় পীড়িত হলে রোযা রেখে তার উপশম খুঁজুন।

প্রত্যহ সামর্থ্য হলে কিছু না কিছু দান করুন। অন্নহীনকে অন্নদান করুন। অক্ষম ব্যক্তির সহযোগিতা করুন। এতীম-বিধবার খোঁজ খবর রাখুন। জানাযায় অংশগ্রহণ করুন। সামাজিক কাজ করুন। সৎকাজে আদেশ করুন ও মন্দ কাজে বাধা দিন। বিবদমান গোষ্ঠীর মাঝে সন্ধি স্থাপন করুন। যুলম থেকে বিরত রেখে যালেমের ও যুলম প্রতিহত করে মযলূমের সহযোগিতা করুন। নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, তা অপরের জন্য পছন্দ করুন। অপরের ত্রুটি গোপন করুন। অপরকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন।

বড়দের সম্মান করুন। আলেমদের শ্রদ্ধা করুন এবং তাঁদের পাশে বসুন। দৈনিক কিছু কিছু করে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করুন। সহীহ দলীল-ভিত্তিক আকীদা, ফারায়েয ও হারাম-হালাল শিখুন।

বিদআত থেকে সুদূরে থাকুন। ইসলামী ক্যাসেট শুনুন। ইসলামী বই পড়ুন। হিকমতের সাথে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করুন। বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করুন। প্রত্যেক কষ্টে সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছেই সাহায্য ভিক্ষা করুন। বিশ্বজাহানের মুসলিমদের জন্য দু'আ করুন। জিহাদের সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুন।

সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আপনার মন আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাক। আপনার হৃদয় মসজিদের সাথে লটকে থাক। সংসারের কাজ থাকলে কাজ করুন। পিতামাতা ও স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করুন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহকে স্মরণ করুন। আযান হলে আবার মসজিদে আসুন।

পিতামাতার হক আদায় করুন। আদায় করুন স্ত্রী-সন্তানের হক। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সাক্ষাৎকারীর হকও ভুলে গিয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবেন না। যেহেতু সেগুলিও তুলনামূলক বড় ইবাদত। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করতে হবে আপনাকে। কোন কিছুতে অবজ্ঞা ও অতিরঞ্জন প্রদর্শন করবেন না। খরচে কার্পণ্য ও অপচয় করবেন না। ব্যবহারে সুন্দর চরিত্র প্রকাশ পাবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে।

কাবীরা গোনাহসমূহ হতে সাবধান থাকুন

১। শির্ক (অতি মহাপাপ)

২। দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখা

৩। শরয়ী ইল্ম গোপন করা

৪। বিশ্বাসঘাতকতা করা

৫। গণকের কথা বিশ্বাস করা

৬। গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা

৭। গায়রুল্লাহর নামে নযর মানা

৮। গায়রুল্লাহর নামে কসম করা

৯। যাদু করা

১০। আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা

১১। মুসলিমের প্রতি কুধারণা রাখা

১২। মুসলিমকে বিনা দলীলে কাফের বলা

১৩। কাফেরকে কাফের না জানা

১৪। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা

১৫। আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা

১৬। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

১৭। তকদীর অস্বীকার করা

১৮। তাবীয বাঁধা

১৯। প্রাণ হত্যা করা

২০। আত্মহত্যা করা

২১। যুলম করা
২২। অপমান ও অপদস্থ
২৩। মিথ্যা বলা
২৪। পরচর্চা বা গীবত করা
২৫। চুগলখোরী করা
২৬। গালি দেওয়া
২৭। মাদকদ্রব্য সেবন করা
২৮। মৃত বা হারাম পশুর মাংস খাওয়া
২৯। বাজে তর্ক করা
৩০। সত্য প্রত্যাখান করা
৩১। ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা
৩২। গালি দেওয়া
৩৩। অহংকার করা
৩৪। নিজের প্রশংসা নিজেই করা
৩৫। অপরের দোষ খোঁজা
৩৬। মূর্তি বা ছবি তৈরী করা
৩৭। এতীমের মাল ভক্ষণ করা
৩৮। জুয়া (ফ্লাশ) খেলা
৩৯। লটারী খেলা
৪০। চুরি করা
৪১। আমানতে খেয়ানত করা
৪২। পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা
৪৩। জমি-জায়গা দাবিয়ে নেওয়া
৪৪। ঘুস খাওয়া
৪৫। সূদ খাওয়া
৪৬। ওজনে নেওয়ার সময় বেশী এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া
৪৭। মিথ্যা কসম খাওয়া
৪৮। ধোকা দেওয়া
৪৯। কসম করে মাল বিক্রি করা
৫০। প্রতিশ্রুতি পালন না করা
৫১। চুক্তি ভঙ্গ করা
৫২। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া
৫৩। সাক্ষ্য গোপন করা
৫৪। মালে ভেজাল দেওয়া

৫৫। প্রয়োজনের সময় মাল গুদামজাত করে রাখা
৫৬। অসিয়ত পালন না করা
৫৭। আল্লাহর ভাগ করা ভাগ্যে সন্তুষ্ট না হওয়া
৫৮। পুরুষের সোনা ও রেশম ব্যবহার
৫৯। পুরুষের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা
৬০। দান করে গেয়ে বেড়ানো
৬১। গান-বাজনা শোনা
৬২। ফরয নামায ত্যাগ করা
৬৩। সময় পার করে নামায পড়া
৬৪। লোক দেখিয়ে ইবাদত করা
৬৫। যাকাত না দেওয়া
৬৬। রোযা না রাখা
৬৭। হজ্জ না করা
৬৮। জিহাদ না করা
৬৯। জিহাদের ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা
৭০। জুমআহ ত্যাগ করা
৭১। জামাআত ত্যাগ করা
৭২। সামর্থ্য থাকতে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজে বাধা না দেওয়া
৭৩। পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচা
৭৪। ইলম অনুযায়ী আমল না করা
৭৫। ব্যভিচার করা
৭৬। মাসিক অবস্থায় সহবাস করা
৭৭। পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করা
৭৮। অবৈধ প্রেম করা
৭৯। সমকাম করা
৮০। হস্তমৈথুন করা
৮১। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া
৮২। মহিলার বেপর্দা হওয়া
৮৩। পুরুষের নারীর মত এবং নারীর পুরুষের মত বেশ ধারণ করা
৮৪। দাড়ি চাঁছা
৮৫। মা-বাপের অবাধ্য হওয়া
৮৬। আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা
৮৭। স্বামীর কথা না মানা
৮৮। পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া

৮৯। পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া তালাক নেওয়া
৯০। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে হালালা বিবাহ দেওয়া ও করা
৯১। এগানা পুরুষ ছাড়া মহিলার একা সফর করা
৯২। পরের বাপকে বাপ বলা
৯৩। বাড়ির মহিলার ব্যাপারে ঈর্ষাহীন (ভেঁড়া) হওয়া
৯৪। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া
৯৫। মহিলার ভ্রূ, মুখের লোম চাঁছা
৯৬। মহিলার পরচুলা ব্যবহার
৯৭। দেহ দেগে নক্সা করা
৯৮। দাঁত ঘষে ফাঁক ফাঁক করা
৯৯। কানাচি পেতে পরের গোপন কথা শোনা
১০০। শোকে মাতম করা

পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিই যে, "সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল পরহেযগারী।"[1] "সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল, যা (পালন করা) সহজ।"[2] "সেই (ধরনের) আমল আল্লাহর অধিক পছন্দনীয়, যে আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।"[3]

আল্লাহর বান্দাদের নিকট পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন যে, তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো আমল করেছে। সুতরাং আমল যত বেশীই হোক, ভালো না হলে মূল্যহীন।

রাসুল (ﷺ) বলেন, "তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। যেহেতু আল্লাহ (সওয়াব দানে) বিরক্তিবোধ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমলে) বিরক্তিবোধ ক'রে বসবে।"[4]

"তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।"[5]

"যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তার জন্মদিন থেকে নিয়ে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাটির উপর উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়, তবুও কিয়ামতের দিন সে তা তুচ্ছ মনে করবে!"[6]

ফাল্লাহুল মুস্তাআন। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে নেক কাজ করার এবং বদ কাজ থেকে দূরে থাকার তওফীক দান করুন এবং 'ইসলামী জীবনধারা'র উপর চলার প্রয়াস দান করুন। আমীন।

অলা হাউলা অলা কুউঅতা ইল্লা বিল্লা

শমুমিনের হাসিয়াল ১৪৩৮ || জুলাই ২০১৭কেই বা এটা পছন্দ করে, তার সাথে কেউ গোমরা মুখে কথা বলুক? কেউই পছন্দ করে না। আমি নিজে যেমন পছন্দ করি না- আমার সাথে কেউ গোমরা মুখে কথা বলুক, তেমনি আমারও উচিত অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলা। এর দ্বারা অন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। একটু মুচকি হাসি দু'জনের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। অপরদিকে গোমরাহমুখে থাকলে দুরত্ব তৈরি হয়। তাই পরিচিত-অপরিচিত সকলের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করব, হাসিমুখে কথা বলব এবং বিনয়ের আচরণ করব। আমার মুখে যেন সবসময় লেগে থাকে হাসির ঝিলিক।বিশ্বাস করো, হাসিমাখা মুখ যেন এক টুকরো চাঁদ। পুর্ণিমার চাঁদ দেখেছ তুমি?

তার আলোয় যেন হৃদয়টাও আলোকিত হয়ে যায়। তেমনি তোমার একটু মুচকি হাসি তোমার ভায়ের হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়। তোমার জন্য তার হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়।

সারাদিনে চলার পথে, কাজে-কর্মে কত মানুষের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। একজন মুসলিম হিসেবে অপর ভাইয়ের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ কেমন হওয়া উচিত- তা নবীজী আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন, একজন মুসলিম অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে। শুধু তাই নয়, এটিকে তিনি ছদাকা হিসেবে গণ্য করেছেন। ('ছদাকা' মানে দান, যার বিনিময়ে আল্লাহ আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন।) একটি হাদীসে নবীজী বলেছেন-

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

প্রতিটি ভালো কাজ ছদাকা। আর গুরুত্বপূর্ণ একটি ভালো কাজ হল, অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৭০

আরেক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

তোমার ভায়ের (সাক্ষাতে) মুচকি হাসাও একটি ছদাকা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৫৬

কারো সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করলে কী হয়? সে খুশি হয়। আর কারো সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করা, যা তাকে অনন্দিত করে- এ কাজটি আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি নিজের কোনো মুসলিম ভাইকে খুশি করার জন্য এমনভাবে সাক্ষাৎ করে, যেমনটি সে পছন্দ করে (এর বিনিময়ে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে খুশি করবেন। -আলমুজামুস সগীর, তবারানী, হাদীস ১১৭৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৩৭২১

সুবহানাল্লাহ, কত বড় ফযীলতের বিষয়! সাধারণ একটি আমলের কত বড় পুরস্কার। হাসিমুখে কথা বলার দ্বারা মুমিন খুশি হয়, আর এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশি হন। আর বিনিময়ে তিনি বান্দাকে কিয়ামতের দিন খুশি করবেন।

ইনশাআল্লাহ, আজ থেকে আমরা সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করব, মুচকি হেসে সালাম দিব, হাসিমুখে কথা বলব

মুমিনের কিছু গুণ

ঈমান কী?

১. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস-হাদীসে জিবরীলে এসেছে-

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ

হযরত জিবরীল আ. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঈমান হল, তুমি ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি

এবং শেষ দিবসের প্রতি। এবং তুমি ঈমান রাখবে তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি’। জিবরীল আ. বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮

ঈমানের স্বাদ

২. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে রবরূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রাসূলরূপে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৪

সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ সেই বুঝতে পারে যার জিহ্বায় স্বাদ আছে। রোগ-ব্যাধির কারণে নষ্ট হয়ে যায়নি। তদ্রূপ ঈমান ও যাবতীয় আমলের স্বাদও ঐ খোশ নসীব ব্যক্তিই অনুভব করে যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিচিত্তে ও সর্বান্তকরণে আল্লাহকে রব ও পরওয়ারদিগার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল ও আদর্শ এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে।

আল্লাহ তাআলা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক কেবলই বংশগত ও প্রথাগত বা কেবলই চিন্তাগত ও বুদ্ধিগত পর্যায়েই নয় বরং সে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং ইসলামের অনুসরণকে মনে-প্রাণে নিজের জীবনে গ্রহণ করে নেবে। সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। (মাআরিফুল হাদীস, হিস্যা : ১, পৃ. ৯১)

ঈমানের মিষ্টতা

৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া, কাউকে ভালোবাসলে শুধু আল্লাহরই জন্য ভালোবাসা, আর কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন ঘৃণা করা, যেমন সে ঘৃণা করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩

এই হাদীসের বিষয়বস্তুও আগের হাদীসের বিষয়বস্তুর প্রায় কাছাকাছি। উপস্থাপনায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এই হাদীসে বলা হচ্ছে, ঈমানের মিষ্টতা ঐ ব্যক্তিই অনুভব করতে পারবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসায় পরিপূর্ণ সমর্পিত থাকবে-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জগতের সবকিছু থেকে বেশি ভালবাসবে। অন্য কারো প্রতি যদি তার ভালবাসা হয়, তা হবে সম্পূর্ণ এই ভালবাসার অধীন। আর ইসলাম তার এতই প্রিয় যে, ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া, কুফুরীতে লিপ্ত হওয়া তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সমতুল্য। (মাআরিফুল হাদীস, হিস্যা : ১, পৃ. ৯১)

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ঈমানের সত্তুরের অধিক (অন্য বর্ণনায় আছে, ষাটের অধিক) শাখা রয়েছে, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর সর্বনিম্ন শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৫

অগ্রগণ্য মত হিসেবে এখানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি। বরং আধিক্য বোঝানোই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের শাখা-প্রশাখা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐসব কর্ম ও আচরণ এবং বাহ্যিক ও আত্মিক ঐসব অবস্থা ও গুণাবলী, যা ঈমানের সূত্র ধরে মুমিনের মাঝে অর্জিত হওয়া কাম্য। বস্তুত যা ঈমানেরই ফল ও নতীজা।

এই হাদীসে ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা বলা হয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়া, যা মূলত ঈমানের প্রবেশ পথ। এর পরে ভালো ও কল্যাণমূলক যত কাজ আছে, আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত বা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, সবই ঈমানের বিভিন্ন পর্যায়ের শাখা। সবশেষে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়াও ঈমানের একটি শাখা।

হাদীসের শেষে বিশেষভাবে হায়ার কথা বলা হয়েছে- 'হায়া বা লজ্জা হল ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মানবীয় স্বভাবের মধ্যে হায়া এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে স্বভাবের তাড়নায়ই মন্দ কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত রাখে এবং অনেক সৎকর্ম ও সুন্দর আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। এদিক থেকে ঈমান ও হায়ার মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র রয়েছে। (মাআরিফুল হাদীস, খ. ১, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০, হিস্যা : ১,

ঈমানের আলামত

৫. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভালো কাজ যদি তোমাকে আনন্দ দেয় আর মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেয় তাহলে তুমি মুমিন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২১৬৬

ঈমানের এক বিশেষ আলামত হল, মুমিন যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন তার অন্তরে আনন্দের অনুভূতি হয়, আর তার থেকে কোনো মন্দ কাজ হয়ে গেলে সে ব্যথিত ও দুঃখিত হয়। যতক্ষণ ব্যক্তির অন্তরে এই অনুভূতি থাকবে, বোঝা যাবে যে, তার ঈমানী রূহ বহাল আছে। এই অনুভূতি এরই ফলাফল। (মাআরিফুল হাদীস খ. ১, হিস্যা. ১, পৃ. ৯০

মুমিনদের একাত্মতা

৬. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ, একে অপরকে শক্তি যোগায়। একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের আঙুল প্রবিষ্ট করে দেখালেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫

৬. প্রাচীরের একেকটি ইট অপরটির সাথে দৃঢ়ভাবে জুরে থাকে। কোথাও সামান্যও ফাঁকা থাকে না। যার ফলে প্রাচীরটি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এমন মজবুত হয়, ঝড়-তুফানে এবং শত্রুর আক্রমণেও তা টলে যায় না। তেমনি মুমিনরাও যেন হয় প্রাচীরের মত। তারা একে অপরের সাথে

দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকবে, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাদের মাঝে কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা থাকবে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাতের আঙুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন, মুমিনদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মানুষ যেন এমনভাবে একতাবদ্ধ হয়, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দুই হাতের বিভিন্ন রকম আঙুলগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে একটি জিনিস, একটি অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। (মাআরিফুল হাদীস, খ. ৩, পৃ. ৩২৬)

৭. নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى

মুমিনদেরকে দেখবে পরস্পরের প্রতি মমতা, হৃদ্যতা ও দয়ার্দ্রতায় এক দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহ অনিদ্রা ও জরাক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে তার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১১; সহীহ মুসলিম, হদীস ২৫৮৬

মুমিনদের পরস্পরের মাঝে ঈমানী বন্ধন কেমন সুদৃঢ় হওয়া উচিত তা আমরা এই হাদীস থেকে পাই। মুমিনদেরকে যে কেউ দেখলেই যেন উপলব্ধি করতে পারে, শুধু ঈমানী যোগসূত্রের কারণেই তারা একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপরের প্রতি মমতা ও হৃদ্যতা পোষণ করে। পৃথিবীর কোথাও কোনো মুমিন আক্রান্ত হলে সবাই তার জন্য এগিয়ে আসে, তার পাশে দাঁড়ায়, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে, ঈমানের দাবিদার হয়েও যদি কারো মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে তার উপলব্ধি করা উচিত যে, এখনো তার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান নসীব হয়নি। ঈমানদারদের এই বৈশিষ্ট্যের কথাই কুরআন মাজীদে এসেছে- رُحَماءُ بَيْنَهُم

(আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র) সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাক্যে। (মাআরিফুল হাদীস খ. ১ হিস্যা-২, পৃ. ১৩৬)

মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তাই পছন্দ করে

৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِه

তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ না করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৫

৯. আবদুল্লাহ ইবনে আম্র রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجنةَ، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

যে চায় তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক, জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তাহলে তার যেন মৃত্যু আসে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ নিজের সাথে করা হোক সে পছন্দ করে। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৮০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৪

মানুষের সাথে আচরণের বিষয়ে অতি সহজ, সুন্দর ও স্বভাব-অনুকূল একটি মূলনীতি আমরা এই হাদীস শরীফ থেকে পাই। প্রায়োগিক জীবনে যদি এই মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয় তাহলে আচরণ হবে নির্ভুল, প্রশান্তিময় ও স্নিগ্ধতাপূর্ণ।

মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার সুন্দর করার গুরুত্ব কত তা এই হাদীস শরীফ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। মানবের চূড়ান্ত সফলতা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের উপায় হিসাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পর উত্তম আচার-ব্যবহারের কথা বলেছেন।

ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্বের দাবি

১০. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ

মুমিন মুমিনের জন্য আয়না, (তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে তা সংশোধন করে দেয়)। আর এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই, সে তার ভাইয়ের জমিজমাকে সুরক্ষা দেয় এবং তার ভাইকে তার পেছন থেকে আগলে রাখে। -সুনানে আবু দাউদ, হদীস ৪৯১৮; আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ২৩৯

আয়নার সামনে যে দাঁড়ায়, আয়না তার চেহারার খুঁত ও অসৌন্দর্য তুলে ধরে এবং হুবহু যা, তাই শুধু প্রকাশ করে। কোনো বাড়ায়-কমায় না। এবং তা তার সামনেই শুধু প্রকাশ করে, অন্য কারো সামনে তা প্রকাশ করে না। তেমনি মুমিন যেন অন্য মুমিনের দোষ ও ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে হয় আয়নার মত। (মাআরিফুল হাদীস খ. ৩, পৃ. ৩৩২

মুমিনদের পরস্পরের সম্পর্ক হল ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ দাবি এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। জমিজমা, জীবিকা এসব নিয়ে দুনিয়াতে মানুষের কত আয়োজন, কত দৌড়ঝাঁপ। একে ঘিরে তার কত দুশ্চিন্তা, কত অস্থিরতা! এসব ক্ষেত্রে মুমিন যেন তার মুমিন ভাইকে সুরক্ষা দেয়, তার আড়ালে-অনুপস্থিতিতেও তাকে যেন সে আগলে রাখে। কোনো মুমিনের মাধ্যমে যেন অন্য মুমিনের কোনো ক্ষতি না হয়। কোনো রকম পেরেশানী না হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা যেন ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিনের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান করেছেন। যারা ইহকালে ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালনা করে তাদের জন্য পরকালে চিরস্থায়ী জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তারা বলে, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবলরা (সম্মানীরা) অবশ্যই দুর্বলকে (হীনদের) বহিষ্কার করবে। শক্তি (সম্মান) তো আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনদেরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

(সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮)

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় পাত্র। আখিরাতে তাদের চিরশান্তির স্থান জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা কাহফ: ১০৭-১০৮)

মুমিনের সম্মান কাবাঘরের চেয়েও বেশি : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুল (সা.) কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। তিনি (কাবাকে লক্ষ্য করে) বলেন, ওহে আল্লাহর ঘর, তুমি কতই পবিত্র এবং তোমার সুঘ্রাণ কতই না মনমাতানো! তুমি কতই না মর্যাদাবান, কত সম্মানের অধিকারী! নিশ্চয়ই সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান, তাদের মাল ও রক্ত। এ জন্য আমরা মুমিনদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করি। (ইবনে মাজাহ : ২/১৮৩০)।

মুমিনের সম্মান ফেরেশতার চেয়েও বেশি : আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করে সৃষ্টি করেছেন। আদম সন্তানকে তিনি অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি। তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদের অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সুরা বনী-ইসরাঈল : ৭০)

ফেরেশতা, জিন, মানব ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি।

জিনজাতির চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি। আদম সন্তানের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ মুমিন ওলি-আউলিয়া তাদের মর্যাদা সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর নবী-রাসুলগণ হলেন মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা তথা জিবরাইল (আ.), মিকাইল (আ.), ইসরাফিল (আ.) ও আজরাইল (আ.)-এর চেয়েও বেশি মর্যাদাবান। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন যে হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি মানবজাতিকে দুনিয়া দান করেছেন, তারা পানাহার করে, বস্ত্র পরিধান করে আর আমরা সদাসর্বদা আপনার প্রশংসা করি ও তাসবিহ পাঠ করি। আমরা পানাহার করি না কৌতুকও করি না। তাই মানবজাতিকে যেভাবে দুনিয়া দান করেছেন তেমনিভাবে আমাদের আখিরাত দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বলেন, যাদের আমি কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছি তাদের সমতুল্য এমন কাউকে করব না, যাদের আমি 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (আল মুজামুল আউসাত: ৭/৯৯)

অসহায় ও দরিদ্র মুমিনের মর্যাদা

মানুষ মাত্রই আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। পার্থিব জীবনে সব মানুষই আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করবে। তবে পরকালে কেবল তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে ধনী-গরিব দুই প্রকারে ভাগ করেছেন। দরিদ্রতা পার্থিব

জীবনে কষ্টের কারণ হলেও পরকালের জীবনে আনন্দের কারণ হবে। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদ পার্থিব জীবনের আনন্দের কারণ হলেও অনেকাংশে পরকালের জীবনে কষ্টের কারণ। ধন-সম্পদের মাধ্যমে দুনিয়াতে মানুষের মর্যাদার তারতম্য করা হলেও পরকালে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য করবেন না। বরং সেদিন আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষের মর্যাদার তারতম্যের একমাত্র মাপকাঠি হবে তাকওয়া তথা খোদাভীতি ও বান্দার নেক আমলের মাধ্যমে। দুনিয়াতে ধনী ও গরিবদের মর্যাদার তারতম্যের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-'(আল্লাহ দুনিয়াতে) একে অন্যের ওপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন।' (সুরা আনআম : ১৬৫)

দরিদ্রতার কারণে কোনো ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তার মর্যাদা ধনীদের থেকেও অনেক বাড়িয়ে দেবেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস (রা.) হতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদিন এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি দরিদ্রদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটি কথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছি। দরিদ্ররা বলে যে, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের ধনদৌলতের দ্বারা আমাদের থেকে অনেক অগ্রগামী। কারণ তাদের ধনদৌলত থাকার কারণে তারা হজ, দান প্রভৃতি ইবাদত করে আল্লাহর দরবারে অনেক উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে। আর আমরা তো এসব থেকে একেবারেই বঞ্চিত। রাসুল (সা.) বললেন, তুমি দরিদ্রদের কাছে আমার এই উপদেশ বাণীটি পৌঁছে দিয়ো-যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এই অবস্থার বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখো, তা হলে তোমাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। যাতে সম্পদশালীদের কোনো অংশ নেই। আর সেই পুরস্কার হচ্ছেÑ১. জান্নাতে লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরি অট্টালিকা হবে। একমাত্র দরিদ্র নবী, দরিদ্র শহিদ এবং দরিদ্র মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। ২. দরিদ্র মুমিন ব্যক্তিরা সম্পদশালী ব্যক্তিদের হতে পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তাম্বিহুল গাফেলিন : ৯৯ পৃ.)

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজে সম্পদশালী হলেও যেন দুর্বল, অসহায়, দরিদ্র মানুষদের ভালোবাসে। কারণ দরিদ্রদের ভালোবাসার মধ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয়জনের ভালোবাসা নিহিত রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সা.)-কে দরিদ্রদের ভালোবাসার ও তাদের সাহচর্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একদা উয়াইনা বিন হোসাইন ফাযারীসহ কয়েকজন স্বগোত্রীয় প্রধান রাসুল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু দরিদ্র-অসহায় সাহাবিকে ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে রাসুল (সা.)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাদের মর্যাদা উচ্চ পর্যায়ের। সুতরাং আমাদের আগমনের সময় আপনি তাদের আমাদের সম্মানার্থে সরিয়ে দেবেন। এ বিষয়ে রাসুল (সা.)-এর মনে চিন্তার উদ্রেক হলে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত নাজিল করে রাসুল (সা.)-কে সতর্ক করে দেন। তিনি যেন দুর্বল, অসহায়, দরিদ্র, গরিব সাহাবিদের তার মজলিস থেকে সরিয়ে না দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলে-'(হে রাসুল!) আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে,

আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।' (সুরা আনয়াম : ৫২)

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের দেখতে মনে হয় গরিব, দুর্বল, অসহায় কিন্তু তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে এতই বেশি যে, তারা কখনো কোনো বিষয়ে শপথ করলে আল্লাহ সেটা পূর্ণ করে দেয়। এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মাথার চুল উশকো-খুশকো, পা দুটো ধূলি-ধূসরিত, তাদের মানুষের দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে কোনো শপথ করে, তা হলে আল্লাহ তায়ালা তাদের শপথ অবশ্যই পরিপূর্ণ করেন।' (মুসলিম : ৬৫৭৬)

ধনীদের মধ্যে যারা জান্নাতে যাবে, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার প্রায় পাঁচশ বছর আগে গরিব, দুর্বল, অসহায় ব্যক্তিরা জান্নাতে যাবে। এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গরিবদের প্রতি বিশেষ এক রহমত যা থেকে ধনী ও সম্পদশালী জান্নাতিরা বঞ্চিত থাকবে। এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমি মিরাজের রজনিতে জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম জান্নাতে প্রবেশকারী অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে নিঃস্ব ও দরিদ্র। সম্পদশালী আর অর্থশালী ব্যক্তিদের আটকে রাখা হয়েছে। এখনও জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি' (বুখারি : ৫১৯৬)। গরিব, দুর্বল, অসহায় ব্যক্তিদের আগে আগে জান্নাতে যাওয়া দেখে, ধন-সম্পদশীল জান্নাতি ব্যক্তিরা সেদিন খুব আফসোস করে বলবে, দুনিয়াতে যদি আমি গরিব হতাম তা হলে আজকে আমিও ধনীদের থেকে পাঁচশ বছর আগেই জান্নাতে যেতে পারতাম।

ধন-সম্পদশীল জান্নাতি ব্যক্তিদের যদি এমন আক্ষেপ হয়, তা হলে সেদিন ধনবান সম্পদশীল জাহান্নামি ব্যক্তিদের কেমন আফসোস হবে? এ জন্য গরিব, দুর্বল, অসহায় ব্যক্তিদের ভালোবাসার অর্থই হচ্ছে, রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসা। কেননা এ ব্যাপারে রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা আমাকে নিঃস্ব দুর্বলদের মধ্যে তালাশ করো। কারণ তোমরা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিজিকপ্রাপ্ত হও' (আবু দাউদ : ২৫৯৪)। সুতরাং আমাদের উচিত হলো গরিব, দুর্বল, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের কখনো অবহেলার চোখে না দেখা। বরং তাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। আল্লাহ তওফিক দিন।

শেষ কথা

পবিত্র জীবনযাপনই সফলতার চাবিকাঠি। কোরআন মজিদের বাণী,
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে,
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
আর ব্যর্থ মনোরথ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষ আচ্ছন্ন করল।' (সুরা-৯১ শামস, আয়াত: ৯-১০)। 'সাবধান!
একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্মকর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।'(সুরা-৩৯ জুমা জু র,আয়াত:৩)।
তাকওয়া বা পরহেজগারি বেশি আমল করাকে বলে না; বরং বদ আমল বা মন্দ কাজ পরিহার করে চলাই হলো
তাকওয়া। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে
দেখতে না–ও পাও; তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।'(বুখারি,হাদিস: ৪৮)।
অন্তরের বিশ্বাসের প্রতিফলনই হলো সব ক্রিয়াকলাপ। একমাত্র চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই সফলতা তথা ইহজগতে শান্তি ও
পরজগতে মুক্তি লাভ সম্ভব। এই জন্য ধর্মাচার, অনুশাসন, বিধিবিধান ও ইবাদত অনুশীলন একান্ত কর্তব্য।